- তৃতীয় সংখ্যা -
জানুয়ারি ২০২২

প্রচেষ্টা

তৃতীয় বর্ষ,
প্রকাশকাল : জানুয়ারী - ২০২২

সম্পাদক

হরিশঙ্কর দে

সহ সম্পাদক

মানবেন্দ্র পাত্র

যোগাযোগের ঠিকানা

প্রচেষ্টা গ্রুপ
রাজপাড়া, এড়গোদা
ঝাড়গ্রাম - ৭২১৫০৫
পশ্চিমবঙ্গ

সামাজিক মাধ্যম

Facebook page : Prochesta Edu Tech
Youtube : Prochesta Group
Whatsapp : 9007422922
Website : www.prochestagroup.com

কথোপকথন

৯৯৩২৬২৯৯৮১, ৭৯৮০৬৬৯৭৭৯

চিঠি পাঠাবেন

প্রচেষ্টা গ্রুপ
রাজপাড়া, এড়গোদা, ঝাড়গ্রাম
পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৫০৫

অক্ষরসজ্জা

বিশ্বজিৎ মেট্যা, মুঠোফোন: ৯৪৩৪৬৮৪৩২২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সঞ্জয় মজুমদার, ঝাড়গ্রাম

বইটি পাবেন

নন্দন ডিজিট্যাল জোন, এড়গোদা
রয়্যাল কম্পিউটার, মেদিনীপুর

বিনিময় - ৬০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

যাঁদের ত্যাগ ও আদর্শ এই ছোট পত্রিকা প্রকাশের একমাত্র ভিত্তি, যাঁদের দ্বারা আমরা প্রতি মুহূর্তে প্রাণিত হই — এই পত্রিকা তাঁদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম...।

সম্পাদকীয়

সমস্ত শুভানুধ্যায়ী, সদস্য-সদস্যা, পরামর্শদাতা, লেখক-লেখিকা, শিল্পী-সর্বোপরি যাঁদের সার্থক প্রচেষ্টায় এই পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করছে তাঁদের প্রত্যেককেই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমরা আন্তরিকভাবেই চেয়েছি পত্রিকাটি সার্বিকভাবে সুন্দর হয়ে উঠুক। তবু এ পত্রিকায় কোনোরকম অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি বা মুদ্রণপ্রমাদ থেকে থাকলে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

কথা প্রসঙ্গে

চারিদিক স্তব্ধ, মনন চিন্তন ও কল্পনার সমস্ত দ্বার অবরুদ্ধ। পৃথিবী যেন একগুঁয়েমি মনোভাব নিয়ে এগোতে শুরু করেছে। নাছোড়বান্দা মনুষ্য সকল পরিবর্তনশীল জগতের গতি আটকে রাখার নিদারুণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। খেলোয়াড় থেকে কবি, সাহিত্যিক, সকলকেই ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে চিত্রগুপ্তের খাতা হতে স্বর্গালোকে কে যেন হাঁক দিচ্ছেন। আর নামোচ্চারণের সাথে সাথে প্রত্যেকেই পৃথিবীর মায়া, মোহ বিসর্জন দিয়ে অমৃতলোকে যাত্রা করছেন। তবে সর্বশেষ সংযোজন মনে হয় বিখ্যাত গবেষক, জঙ্গলমহলের এনসাইক্লোপেডিয়া ড. সুব্রত মুখোপাধ্যায়। 'প্রচেষ্টা'র আত্মিক সম্পর্ককেও ছিন্ন করে কখন যে চলে গেলেন তা ভাবনারও অতীত। উনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

''ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই / জানি আমি ভাবি বনস্পতি''— এই কথা যখন আলোচনা হয়, তখন বুকটা আমার গর্বে ভরে ওঠে। আড় চোখে নিজেকে নিজের মত করে মেপে নিয়ে বলি না ''এখনো তো বড় হইনি আমি''। আমার বয়স মাত্র তিন। গুরুজনের আশীর্বাদ ও ছোটদের ভালোবাসা যেন সারা জীবন পাই, তাহলেই আমার জন্ম সার্থক হবে। আর হ্যাঁ কোনও দোষ-ত্রুটি ধরা পড়লেই সরাসরি আমাকে জানান, কথা দিচ্ছি আমি আমার ভুল সংশোধন করে নেব।

এ তো গেল ''আমাদের অনাড়ম্বর প্রচেষ্টা''র কথা। কথা বলতে শুরু করলে আর শেষ হয় না। সেই কথায় আছে না— ''জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো''। তবে ভালো শব্দ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বঝি না, কিন্তু ''এখন অবাক হয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে''- যেন পরিবেশ পরিস্থিতির কিছুটা আঁচের গনগনে আগুনের উত্তাপ পাই শুধু নয়, তার ভয়াবহতাও ''দেখে ভারী কষ্ট হত আমাদের''। আর তাই তো সচেতনতা শিবির, ত্রাণ বিতরণ, অতিথি শ্রমিকদের খাওয়ানো, গ্রন্থযাত্রা, বৃক্ষরোপণ, বস্ত্রদানের মত কাজগুলি ''প্রচেষ্টা'' তার নিজের নিয়মেই ও ছন্দেই চালিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে ভবিষ্যতেও চালিয়ে যাবে বলে আশা রাখি।

শিক্ষা আমাদের উদ্দেশ্য ও সাফল্য আমাদের লক্ষ্য এটাকে নিয়ে চলতে চাওয়া ''প্রচেষ্টা'' যেন তার শাখা, প্রশাখা, বিস্তার করে সমাজ কল্যাণে, মানব হিত সাধনের আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবে তা দৃঢ় কণ্ঠে বলাই যায়।

শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক সহ মুদ্রণ সংস্থার সকলকে ও পাঠকবৃন্দকে যথাযোগ্য স্থানে সম্মান জানিয়ে আজ রাখলাম। পরে আবার কথা হবে।

নমস্কারান্তে—
প্রচেষ্টার পক্ষে
মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী

প্রসঙ্গ ''প্রচেষ্টা'' সাহিত্য পত্রিকা

ড. অসিত বরণ ষড়ংগী

''প্রচেষ্টা'' সাহিত্য পত্রিকা জানুয়ারী ২০২১ সংকলন প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে ইংরেজ কবি Keats এর একটি অনবদ্য উচ্চারণ মনে পড়ে : ''A thing of beauty is a joy for ever.'' চিরকালীন সাহিত্য যেন সৌন্দর্যের স্বর্ণকমল লিটল ম্যাগাজিনের মধ্যে কালজয়ী সৌন্দর্য চেতনা ও জীবনধর্মী উপস্থাপনার উজ্জ্বল উপস্থিতি পরিদৃশ্যমান। ''প্রচেষ্টা'' সাহিত্য পত্রিকা জানুয়ারী ২০২১ সংকলনটি প্রচেষ্টা গ্রুপের ঋদ্ধ মননশীলতার ইংগিত দেয়। এটি নিঃসন্দেহে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস ও প্রচেষ্টার ফসল-জীবন বোধের উন্মুখর উচ্চারণ— যার মধ্যে খুঁজে পাই মিশ্রপ্রাণের বীজমন্ত্র। পথ চলাতেই তার আনন্দ। সমস্ত দীনতা ও জীর্ণতা ঝরিয়ে দিয়ে— আলোকের ঝর্ণাধারায় জীবনের সকল ম্লানতা ধুইয়ে দিয়ে সে তার পুণ্যবাণী ছড়িয়ে দেয় হৃদয়ের মর্মলোকে।

এই সংকলনটির গুণগত উৎকর্ষ ফুটে উঠেছে — inward eye এর শিল্পিত প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়। প্রচেষ্টার চোখ যেন ''Other Worldliness'' এর কথা বলে। সেই চোখে বিশ্বচেতনার ছবি। শাশ্বত সময়ের সংলাপ। অনাড়ম্বর প্রচেষ্টার কুম্ভীপাক। ফুটে উঠেছে Unadorned beauty 'জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম জেলার নানান জাতি-উপজাতির মানুষের কথা ও কাহিনীকে জীবনবোধের রসায়নে জারিত করে কবি ও লেখকেরা এই পত্রিকাটিকে অপরূপ লাবণ্যে ভরিয়ে দিয়েছেন। 'প্রচেষ্টা' পরিবারের অন্যতম শরিক মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ভাষায় :

> ''এই অতিমারীতে ''প্রচেষ্টা'' তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, চরৈবেতি মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছে সমুখপানে। বৃক্ষরোপন, গ্রন্থযাত্রা, বস্ত্রদান, করোনার মতো অতিমারীতে এলাকার মানুষের সাথে ও পাশে থেকে মাস্ক ও ত্রাণ বিতরণের সাথে জঙ্গল মহলের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ''প্রচেষ্টা'' পত্রিকার মাধ্যমে ঘটাতে পেরে আমি আনন্দিত''।

—মুকুন্দরামের এহেন আনন্দযজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ। কেউ ব্রাত্যজন নয়। সংস্কৃতি-চেতনার উল্লেখ ঘটানো সাহিত্য-পত্রিকার মূল লক্ষ্য। ''প্রচেষ্টা''র অন্তরশায়ী লক্ষ্য সংস্কৃতি সম্পন্ন মননের বিকশন-জীবনের সৌন্দর্যায়ন ও মানবিক মূল্যবোধের বিকিরণ।

''প্রচেষ্টা''র জানুয়ারী ২০২১ সংখ্যায় কবিতার বর্ণচ্ছটা আমাকে বিমুগ্ধ করে। ''অপারদর্শী'' কবিতায় উদয়শংকর রক্ষিতের কয়েকটি লাইন হৃদয়স্পর্শী নম্রতায় নীল :

অস্ত্রশিক্ষায় তুমি এখন
বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছো।
তরবারিতে লেগে থাকা রক্ত মুছতে মুছতে
বললে—
''গুরুদক্ষিণাটা দিয়ে এলাম গুরুদেব''।

''সম্প্রদান'' কবিতায় রাজা ভট্টাচার্যের অমোঘ উচ্চারণ :

সমুদ্রের কাছে গোপনীয়তা কিসের সে তো ছুঁয়ে যাবেই।

রহস্য
শরীর
অতীত
অনুভূতি
কবিতাটির গভীরতা ও রহস্যময়তা প্রেক্ষণীয়।

শাশ্বতী হোসেনের লোকভাষায় বিরচিত ''লড়াই'' কবিতাটি ধ্রূপদী মহিমায় অন্বিত।

''হে কাল—
তুমি হৃদয় বোঝ না''

সুনীত দত্তের 'শর্ত' কবিতার এই দুটি লাইন হৃদয়ের দরোজা খুলে দেয়।

''গল্প ও কথা'' বিভাগে রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এখানকার ভাষা' ও ড. সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ''দনুজদলনীর দনুজ যখন দেবতা'' প্রবন্ধ দুটি ভালো লেগেছে।

সুস্মিতা রায়চৌধুরীর ''আত্মজা'' জয় স্যান্যালের ''প্রতিপালন'', সুমন চ্যাটার্জীর ''রিভার্স মেটামরফসিস'' গল্পগুলোর মধ্যে বাস্তবতার (realism) ছোঁয়া রয়েছে। গল্পগুলো পাঠকের অন্তরে দাগ কেটে দেয়। বিমল লামার ''লাদেন'' গল্পটি সত্যিই সুখপাঠ্য। জ্যোৎস্না সোরেনের ''সারি সহরায়'' প্রবন্ধটি জঙ্গলমহলের জনজাতির লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের দিকটিকে আলোকিত করেছে। গবেষণাধর্মী এই প্রবন্ধটি সত্যিই উপভোগ্য।

উপসংহারে বলা যায় ''প্রচেষ্টা'' পত্রিকাটির পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর activity-র মধ্যে— Activity is the expression of identity. সাহিত্য ও সংস্কৃতির identity নিহিত রয়েছে শুদ্ধ সৃজনশীলতার গভীরতায়। ''প্রচেষ্টা'' সর্বতোভাবে জীবনের বহমানতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ''প্রচেষ্টা''র অভিমুখ অনিকেত সত্যানুসন্ধান। ''Truth is beauty, beauty is truth.''

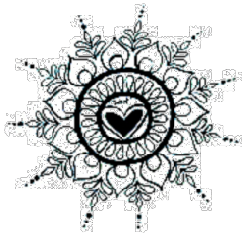

সূচিপত্র

কবিতা

পুরন্দর ভৌমিক, সৈয়দ স্নেহাংশু, ভিক্টর মাহাত, পলি দে, হিমাংশু শেখর মাহাত, ঋতশ্রী মান্না, বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীতনু চৌধুরী, জয়ন্ত দাস, সুদীপ পাল, নীলাঞ্জন চক্রবর্তী, অমৃত ঘোষ, ঊষা মুর্মু, মুকুন্দ কর, দেবাশিস দণ্ড, জয় সান্যাল (ফুসকুড়ি), অসিত মাহাত, অপূর্ব পাল, পম্পা মণ্ডল, অনির্বাণ মাহাত, চয়ন রায়, মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী, চিত্ত মন্ডল, সমীরণ দত্ত, মৃত্যুঞ্জয় দাস, দেবব্রত দত্ত, সাঁঝবাতি পাল, রাকেশ আর্য, কৃষ্ণেন্দু দাস, মৌপর্ণা মুখোপাধ্যায়, প্রণব মাহাত, মনতোষ মন্ডল, প্রবীর কুমার দত্ত, বুদ্ধদেব মাহাত, মানবেন্দ্র পাত্র, সুব্রত দাস, পিয়াসা ভট্টাচার্য দাশগুপ্ত, রাজেশ মাহাত, আশিস দত্ত, রাজা ভট্টাচার্য, শাস্বতী হোসেন, সুমন রায়, শঙ্খশুভ্র পাত্র, অন্তরা মুখোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্র নাথ মাহাত, গৌতম মাহাতো, অনুরাধা কর্মকার (রানা), রাজুরানা দাস, পীযূষ প্রতিহার, স্বর্ণেন্দু সেনগুপ্ত, সুকমল বসু, রিম্পা ষড়ংগী, সমীর শীট, স্নেহাশীষ দাস (তুফান স্নেহাশীষ), আশিস অধিকারী, নীলেন্দু মহাত, সোমা প্রধান, খুকু ভুঞ্যা, অনুষ্কা ঘোষাল, অমিত পণ্ডিত, বিরূপাক্ষ পন্ডা, সাগর মাহাত, ফিরোজ আখতার, ভরত চন্দ্র মাহাত, পিয়ালী বেরা, পিকু (তাপস সাঁতরা), চিত্ত মাহাতো, তমোঘ্ন মুখোপাধ্যায়, মনীষা ঘোষাল (মল্লিক), প্রসাদ মল্লিক, সুদীপ্ত বিশাল, গৌতম নায়েক, পম্পা দাস, সৌরভ মিশ্র, সায়ন মিত্র, চৈতালী সাহু, মধুমিতা দত্ত সিংহ, অঞ্জন সিকদার, আরতী পাল, সৌমিত্র মুখার্জী, দুঃখানন্দ মণ্ডল, রোহিনী নন্দন কদমা, তপন চক্রবর্তী, জিতেন্দ্র নাথ মাহাত, অসীম মাহাত, প্রসেনজিৎ বেরা, অনামিকা দত্ত, তপন সনগিরি, সৌমেন্দ্র দত্ত ভৌমিক, শচীন প্রামানিক, মন্দিরা মিত্র, আতাউল গাওস, তমাল চক্রবর্ত্তী, কমলেশ নন্দ, শেখর মাহাত, সুমন চ্যাটার্জী, লক্ষীন্দর শীট

গল্প ও কথা

সুস্মিতা রায়চৌধুরী, দেবাঞ্জন ঘণ্টেশ্বরী, চণ্ডীচরণ দাস, সূর্যকান্ত মাহাতো, অরুণাভ বীর, প্রদীপ মাহাত, রাকেশ সিংহ দেব, লক্ষীন্দর পলোই, অমর সাহা, জ্যোৎস্না সোরেন, সুমন্ত কর্মকার, নলিনী বেরা, বিকাশ রায়, শান্তনু পন্ডা, হরিশঙ্কর দে, দেবাশীষ সরখেল, সৌমেন মণ্ডল, প্রিয়ব্রত গোস্বামী, রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস দে

কবিতা

গোলাপের সুতোগুলো খুলে নাও
পুরন্দর ভৌমিক

বিছানার চাদরে বোনা গোলাপের সুতোগুলো খুলে নাও,
আমার খুব কষ্ট হচ্ছে !
ফেসশিল্ডের বাষ্পকাঁচের অস্থায়ী ভোর আমার সূর্যকে
আবছা করে দিচ্ছে;
আমার খুব কষ্ট হচ্ছে!
যযাতির ধমনী-শিরায় শুধু নিজেকেই ফাঁকি দিচ্ছি;
শূন্য হাতে সময় নষ্ট-কারণে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে!
বিছানার চাদরে বোনা গোলাপের সুতোগুলো খুলে নাও,
আমার খুব কষ্ট হচ্ছে!

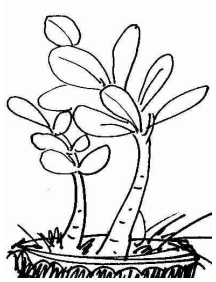

ঘাম আর দুঃস্বপ্নের প্রতিটি ফোঁটায় এখন মহামারির তেলরঙ।
বিপন্ন চিত্রের কোনায় ঠোঁট আটকে বসে আছে কালের শকুন;
আমরা সবাই এ্যাসিড-শুদ্ধ ভোজ্য তালিকা এখন!
আমার রাতের বিছানা থেকে সরিয়ে নাও সব রজনীগন্ধা
পারো যদি ঢেলে দাও মাঝরাতে এক শিশি আলতা।
শিশুর হাতের অবুঝ ভাষায় এসো সারারাত
আলতা মাখাই বিছানায়- চাদরে;
যদি জেগে ওঠে কোনো নতুন সূর্য!
চেতনা আর প্রত্যয়ে জন্ম নিক একটা সবুজ চাদর,
এতদিনের নীল বিষাক্ত রক্তেরা হয়ে যাক একটা নদী,
সে নদীর তীর ঘেঁষে জাগুক একটা আলতা-ভোর;
সূর্য উঠলে ফুল তো আপনিই ফুটবে!

শুধু আজ রাতে
বিছানার চাদরে বোনা গোলাপের প্রতিটি সুতো খুলে নাও,
আমার খুব কষ্ট হচ্ছে!
খুব কষ্ট হচ্ছে!

মিথ্যের বিপরীত
সৈয়দ স্নেহাংশু

একদিন ধ্বংস হবোই
এ আমাদের অধিকারের মধ্যে পড়ে.....
চলো পায়রা ওড়াই
সাদা কালো ধূসর ময়ূরকণ্ঠী
যার যেমন খুশি....

ঘূর্ণি
ভিক্টর মাহাত

পাতা ঝরানো উদাসীন ঘূর্ণি অনুভবে শৈশবের কান্না
বাতাসের পাতারা উড়ছে সুখ, অসুখ যন্ত্রণার নৈরাজ্যে
জীর্ণ বয়সে কত জীবনের মাটির ভাষা পোড়া গন্ধ পায়
রোদ বিছানায় মেঘলা হয়ে আসে আমার প্রসন্ন হাসি
একগোছা ধূলোমাখা সন্ধ্যার শুষ্ক পরাগ
খোলস ছেড়ে কত যন্ত্রের আলো ছায়া রং বিন্যাস
পথ দেখানো সুনীল বৃত্তে অতলান্ত স্নেহের মহিমা ঝরে
সকলেই পাই বয়ঃসন্ধি মাপলে সবুজ স্পন্দন
প্রচ্ছায়ার বিভাজন হতে পারে জন্মের খনন
আমি ঘূর্ণিতে বিপাকে পড়েছি লুকোচুরির মতো
শৈশবের শ্বাসবায়ু ধরে রাখার ক্ষমতা নেই।

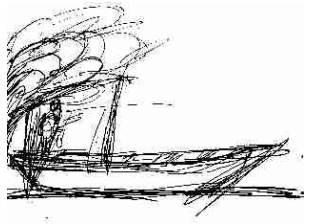

তবু বিস্মৃতির অতলে থাকা আলাপের সুর বাজে
লোভনীয় মায়াবী আবেশে
কতশত বেমালুম সোনালী স্বপ্ন ঘূর্ণির কবলে দিশাহীন
মরমী আলো হয়ে আসবে না অতীতের সেই দিন।

বুকের ভেতর প্রবাহিত নদী
আহ্লাদের প্রতিধ্বনি ভাসায়
খুশির উন্মেষ আস্বাদ
সৃজনের লেনদেন গোধূলীর শেষ অধ্যায়

ভাষাহীন ক্রন্দন, রোদ্দুরের স্বল্প সঞ্চয়
নৈসর্গিক রাত দিন শুধু ব্যবধান
উজানে তরঙ্গের জলকেলি।

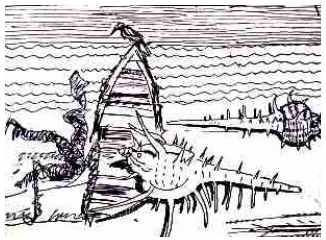

জীবন নদী
পলি দে

অনেক কথা আছে
যেগুলো শুধু নদীকেই বলা যায়।
মায়ের আচঁলের গন্ধ পাই
ওঁর কায়া ভূমিতে।
নিরব নির্বিকার অথচ গভীর,
আর ক্ষীণ ভাবে বয়ে যাওয়ার
ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।
ঠিক একটা আটপৌড় জীবনের মতো।
গতি নেই, কাছে গেলে বোঝা যায়
লড়াইগুলো কিভাবে
জীবনের বাঁকে ফেলে আসতে হয়।
কেবল বুকে মাথা রাখলেই
শোনা যায় হৃদস্পন্দন...

কুয়াশাকিশোর
ঋতশ্রী মান্না

আলগোছে যা উড়িয়ে দিল মন
তুলোর পালক, অনেকখানি দূরে
হাওয়ায় তবু ভাসছে পুরাতন
চেনা গল্পের পড়ন্ত রোদ্দুরে।

কিছু গল্পেরা বাতাসে অন্তরীন
তাদের না হয় 'বিষাদ' বলে ডাকি
নতুন গল্পে ফুটে উঠছিল দিন
স্মৃতির খাতায় বেশকিছু ধার বাকি।

স্রোতের গায়ে ভগ্ন বিসর্জন,
ঠোঁটের পাশে সংসারী খড়কুটো
বাতাস বয়েছে অসহায় নির্জন
দুঃখ মাপছে গেরস্থালি মুঠো।

হাঁসের ডানা ঝেড়ে নিচ্ছে জল,
শোক অথবা বাতিল কোনো স্নান
স্তব্ধ ব্যথা, কথার চলাচল
না লেখা শব্দে একা হয় অভিধান।

বালিশের গায়ে ছেড়ে রাখা চেনাঘুমে
প্রাচীন গল্পে পায়ে পায়ে নামে ভোর
বাতিল রাস্তা, বিষন্ন মরসুমে
কুয়াশাকিশোর, হেঁটে চলা থাক তোর...

আলো রাত্রিতে
হিমাংশু শেখর মাহাত

বলেছ কি তুমি, আজকে অমাতিথি ?
বীথি উড়ে গেছে মাঝ রাত্রির ঘনে
নদী ভেসে এলো থুতনি ছুঁল জল
ঘোমটা ঠেলে আলাপ জমার ক্ষণে।

বাজার বসেছে বিকিকিনির ছলে !
পলাশ শিমুল নবপল্লবে মাতে
ফুলের বাসর রতির প্রতিভাসে
আশাবরী বয় আলোকের সঙ্গীতে।

দেখছো নাকি ভাসছে হাওয়া ঘরে
চুলের খোঁপায় হবেই রতি স্নান
ছুঁতেও পারো গভীর নিশ্বাস ধরে
যীমুত বাহনে ঢেউ ভাসানো গান।

এক বসন্তে সে আটপৌড়ে উর্বশী
সুখের দুয়ারে বাতাস নড়ে চড়ে
উতলা পারদ নাভি পল্লব ছুঁল
ফেনিল বাসনা নতুন ধারা গড়ে।

চাঁদ
বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

হারাতে হারাতে চাঁদ
একদিন নিজেকেই পূর্ণ করে তোলে
ম্যাজিক জ্যোৎস্নায় দেখি
অদ্ভুত মায়ার শরীর।

আকাশে পরব ওই
আলোরঙ মেখে

চাঁদ নয় চাষীবউ হাসিমুখে
আকাশ ভরিয়ে আজ মাড়ুলি দিয়েছে।

ডুলুং দরবার
শ্রীতনু চৌধুরী

নদীর সখ বোধ হয়
এবার মিটল তোমার

অজস্র পুরানো প্রস্তর নিয়ে
কোনো এক অচেনা বাঁকে
খুলে বসেছ ডুলুং দরবার
সেখানে শালের ছায়া এসে পড়ে
সেখানে পায়রার মাংসে চলে চড়ুইভাতি

শিলাই সুলুক ক্রমশঃ নীল, শামুক সমাকৃতি
কী আনবে তার জন্য ?
বিস্মৃত রেনু পড়ে আছে সুবর্ণরেখায়

শালগম চিবানো কষ্টিপাথরের শিশুটির হাতে
একটি ঘুড়ি দিয়ে
দেখিয়ে দিও তাকে অনন্ত আকাশ

তুলোর পাহাড়ে লুকানো
সেই গোপন তিলটির কথা
সভ্যতা না জানুক
একমাত্র আমিই জানি

সে কথা তো তুমি জানো, রাই !

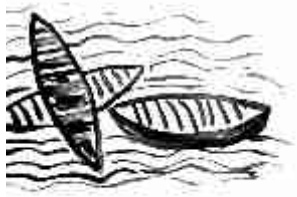

শ্যাম তোর
জয়ন্ত দাস

শ্যাম তোর বাঁশি লাল রঙ ?
তরঙ্গিণীতে ভাসে লাশ —
জল ছলছল সফরির সাঁতার যৌবন
ভাদ্রের শেষে তারা ফিরে যাবে ঘরে !

শ্যাম তোর বাঁশি লাল রঙ ?
রাধার ফাগুন রঙ হারিয়েছে বিভা তার,
নূপুর হারিয়ে গেছে ঠগের বাজারে!
প্রেম-হেম মিথ্যা বিলাস!

শ্যাম-তোর বাঁশি লাল রঙ ?

পরিযায়ী শ্রমিক
সুদীপ পাল

কাজ করতে শ্রমিকরা সব
দিয়েছিল ভিন রাজ্যে পাড়ি।
হঠাৎ করে লক ডাউনের জন্য
পায়ে হেঁটে ফিরছিল তারা গ্রামের বাড়ি।
কয়েকশো মাইল হাঁটতে হাঁটতে
যখন তারা খুব পরিশ্রান্ত।
রেললাইনের উপর বসে পড়লো তারা
শরীরটা যে তখন তাদের খুব ক্লান্ত।।
ভোরের আলো ফোটার আগেই
সেই রেললাইনের উপর
আসলো মালগাড়ি।।
এক ধাক্কায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো
ঘুমন্ত শ্রমিকদের শরীর গুলি।।
মৃতদেহগুলি পড়ে রইলো রেল লাইনের
উপর সারিসারি।।
পরিযায়ী শ্রমিকদের আর ফেরা হলো না
নিজের গ্রামের বাড়ি।।

অশ্বত্থামা

নীলাঞ্জন চক্রবর্তী

চোখের মহাসাগরে
লবণাক্ত স্নান শেষ করে,
সাদা শরীর নিয়ে বসে আছি।

অস্থির অস্থি'র ভাঁজে একতিল মাংস নেই।
একদা পরাক্রমী দেহে-
বিন্দুমাত্র বল নেই !

দৃষ্টি গলে পড়ছে গাল বেয়ে,
কপাল জুড়ে হাঁ করে আছে —
কালগহ্বর !

শতাধিক যুগ পুরাতন অস্পৃশ্যকে
আজকাল গ্রাস করে আসে
অস্পর্শকাতরতা।

অভুক্ত বন্যেরাও
আর ছোঁয়না এই কলঙ্কের ছায়া।
ভিক্ষার বদলে
ঝুলি ভরে কুড়িয়ে আনি অভিশাপ।
দয়ার উপাচার —
আমায় অসুস্থ করে আরও!

সব শোক মুছে গেছে,
সাথে মুছে ফেলেছি অনুভূতি সকল।
কেবল পাপের আগুনে
আলোকিত স্মৃতি —
নিপুণতম স্থৈর্যের সাথে
সম্পৃক্ত করে চলেছে আমায়।

যুদ্ধ তো কম করিনি!
হানিনি আঘাত কিছু কম!
ব্যভিচার ?....
কার্পণ্য করিনি কভু।

তবে প্রভু,
শাস্তি নেহাতই কম কেন ?
এই অনন্তকালীন প্রতীক্ষা —
কেন এত কম বলে মনে হয় ?

গৃহপরী

অমৃত ঘোষ

আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে আজও কন্যা সন্তান বহুলাংশেই ইপ্সিত বা কাম্য নয়। তারা অনভিপ্রেত অযত্নলব্ধ-ব্রাত্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এক ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে এই ছোট্টপরীদের প্রতি অনন্ত অকৃত্রিম স্নেহানুভূতি-অনিরুদ্ধ ও অবিনশ্বর। যা থেমেও থাকে না, আবার মরেও না। বড় জোর সঞ্চারিত হয় এক থেকে অন্যে বায়ুতাড়িত পুঞ্জীভূত মেঘমালার মত সুদূর দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে। শীঘ্রই চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন হবে এমনই প্রত্যয় নিয়ে তাদের জন্য আমার কবিতা —

গৃহকোণ সাজে আজি নব কলেবরে
তার গৃহলক্ষ্মীরে বরণের তরে।
আকূল আনন্দধারা বহিয়া বেড়ায়
ক্লেশের কোথাও আর লেশ নাহি রয়।
এঘরে ওঘরে তাই সাজো সাজো রবে
অপার পুলক জাগে কি দারুণ হরষে।

ধরাধামে একখানি শশীকণা খসি পড়ি
তুলিয়াছে ঘর-দ্বার আলোকিত করি।
ভুবনমোহিনী শুভ্রহাসিনী
ভরিতেছে প্রাণ দিবসরজনী।
খিলিখিলি হাসি হাসি কুন্দ-বরণা
ঘুচাইয়াছে মনঃপীড়া চন্দ্র-বদনা।

জনে জনে খুঁজে ফেরে
কি নামে যে ডাকে তারে
যে নামেতে সর্বসুখ
ভরিবে প্রাণ, ঘুচিবে দুখ।
আকাশ কুসুম কল্পনা করি
ঢালিয়া মনের সকল মাধুরী
রাখে তার নাম খানি।

ভ্রমরেরা বাঁধে তার লোহিত বসনে
ওই বুঝি পলাশেরা ফুটিয়াছে বনে।
নীলবসনে তারে লাগে নীলপরী
শুক্লশুভ্র বসনে সাজে দেবী সরস্বতী।

পেচকবাহিনী সাথে শ্বেতপদ্মাসনা।
সহাবস্থানে রবে -এ মোর প্রার্থনা।
অসীম আশীষবারি ঝরে মাথা 'পরে
এই নিবেদন করি কৃতাঞ্জলিপুটে।

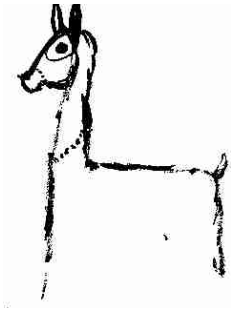

এক নদীঘাটের দুঃখকথা
মুকুন্দ কর

নাম না জানা যে ছেলেটা
প্রতিদিন এসে আমার কোলে বসে
শান্ত স্বচ্ছ জলে পা দুলাতো-
অনেক দিন হয়ে গেল তাকে আর
দেখতে পাইনি।

এক অজানা গোধূলিতে যে মেয়েটা
হাতে দড়ি নিয়ে এসেছিল...
যে মেয়েটাকে আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম-ওই উঁচু
বৃদ্ধ বটগাছটার দিকে চাতকের ন্যায় মুখ তুলে
উদার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার ফিরে যেতে,
তাকেও আর দেখতে পাইনি।

অনেকগুলো বছর কেটে গেল....

আজও ভিড় হয়, আজও দলে দলে
পূণ্যার্থীরা দেবতার উদ্দেশ্যে
জল নিতে আসে;
ভিড় শেষে আজও কোনো বিদেশী সাহেব বিবি
হাতে হাত রেখে গল্প করে....
কিন্তু,
সেই ভিখারিটি– যে দু'হাত পেতে
আধুলি কয়েন সংগ্রহ করে ঝুলিতে ভরতো...
জ্যোৎস্নার আলোয় যে বুকের উপর হাত রেখে
এক অব্যক্ত যন্ত্রণা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত
তাকেও আজ আর দেখা যায়না।

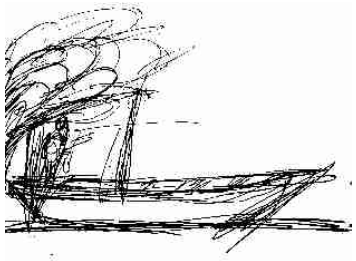

সারমেয়
ঊষা মুর্মু

যেদিন ফিরিয়ে দিলাম
নুড়ি বিছানো পথে সে চলে গেল।
দুহাত ঝুলেছিল হাঁটুর নিচে
ঘাড়ও কি ঝুঁকে ছিল বুকের উপর!
কোথা থেকে যেন তিনটি সারমেয়
হায়নার চরিত্র নিয়ে খেয়ে গেল কাছে
ঘুরে তাকিয়েছিল শুধু, চোখে অপার করুণা নিয়ে-

আমি ঠাঁই দাড়িয়ে থাকি জানালায় হেমন্তের রাতে
ঝুপ ঝাপ ঝরে পড়ে কুয়াশা একাকি।

চেনা ছবি
দেবাশিস দণ্ড

আমাদের উঠোনে বুড়ি কামিনী গাছটা আজও আছে
গাছতলায় আজও লুটায় বুড়ির সাদা আঁচল।
ওই আঁচলপাতা গাছতলায়
ছিল আমাদের খেলনাবাটির সংসার।

পায়ের পাতায় ফুল ফোটানো দিন ছিল আমাদের।

দত্তকাকুর ছেলে পিলু প্রায়ই আমার বর হত
বাগান তোলপাড় করে
কতরকম পাতাই যে কুড়িয়ে আনতো- নামগোত্রহীন।
মুঠো ভরে ধুলো আনতো
পকেট ভরে কাঁকর।

আমি তখন খেলনাবাটির সংসারে পাকা গিন্নি
ধুলোর মশলা দিয়ে অচেনা পাতার চচ্চড়ি রাঁধতাম
হাঁড়িতে টগবগ কর ফুটতো নুড়ি কাঁকড়ের ভাত।

খাদ্য নয় —
তবু খাওয়ার পাতে উঠে আসতো কত কিছু
সবই পরমানন্দের পরমান্ন।

কুয়োর পাড় থেকে বাগান অবধি
বাবা একটা নালা কেটে দিয়েছিল।
এক পশলা বৃষ্টিতে সেই নালা ফুলে ফেঁপে
থইথই একটা নদী।
ছোটবেলার ছোটনদী-
একেকটা বৃষ্টিতে একেকরকম নাম হত নদীটার।
নদীতে আমাদের কাগজের নৌকো ভাসতো
টলমল করতে করতে সেই বাগান আবধি চলে যেত
হারিয়ে যেত বেগুনগাছের তলায়।

ছোটবেলার ছবিগুলো বড় মিলে যায় ইদানীং
আজও খাওয়ার পাতে উঠে আসে এমন কত কিছু
যা আদপেই খাদ্য নয়।
আজও চোখের সামনে নদীরা মরতে মরতে
ছোট্ট একটি নালা।

২১শে
জয় সান্যাল (ফুসকুড়ি)

পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়ায়,
হাজার কোকিল গান শোনায়;
বাংলায় আজ কিসের মিছিল ?
পথ-ঘাট সব রক্ত রাঙায় ?

জানালা খুলে দেখছিলেন-
বেণীমাধবের মা,
মুচকি হেসে বললেন-
খোকা, আয় দেখে যা।

রাস্তা জুড়ে লোক থৈথৈ,
কোলাহল মানে শুধু হই হই,
আজ কি কোন উৎসব আছে,
তাহলে কি কিছু ঘটল পাছে ?

পিছন ফিরে চাইলেন মা-
খোকা নেই তো ঘরে,
ঘরে শুধুই বই ছড়ানো!
এদিকে-ওদিক পড়ে।

আশঙ্কার মেঘ বুকে নিয়ে
ছুটলেন মা দরজা খুলে,-
পথে লুটায় ছেলের দেহ
রক্ত রাঙা পলাশ ফুলে।

লক্ষ মানুষ আওয়াজ তোলেন
আবেগে-উচ্ছাসে,
তোমার ছেলে প্রাণ দিয়েছে
ভাষা-কে ভালোবেসে।

মৃত ছেলেকে জড়িয়ে মায়ের
গলা হয়ে এলো ভারী,
রক্ত দিয়ে লেখা হলো সেদিন-
একুশে ফেব্রুয়ারি!!

কান পেতে আছি

অপূর্ব পাল

কাঠঠোকরা ডাকলে
বাড়িতে নাকি অতিথি আসে !
সে তো নেই; হৃদয় তো সেই
কবে থেকেই শুকনো কাঠ;

নীরবতার মতো দাঁড়িয়ে থাকা
সুপুরি গাছটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে
কাঠঠোকরা পাখি
ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছে একাকিত্ব

আর আমি,
এক পরম আত্মীয়ের
পদধ্বনির আশায়
কান পেতে আছি....

অপমৃত্যু

পম্পা মণ্ডল

বড় অস্থির লাগছে।
সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব লোকলজ্জায়
লালিত ইচ্ছের অপমৃত্যু সহ্য-
মৃত্যু শোকের অধিক!
ক্রমাগত রুদ্ধ হয়ে আসা কণ্ঠনালী
চিরে চিরে কান্না আসতে চাইছে,
জলপ্রপাতের মত আছড়াতে চাইছে,
লকগেটে আটকে পড়ছে
আবেগের জলোচ্ছ্বাস।
কান্নার কারণ গোপন জানে,
গোপন জানে আকাশ-মুক্ত
তবুও রহস্যে ভরা আকাশ!
একটা শূন্য চরাচর দাও-
কান্না সমাধিস্থ করি,
তারপর শুকনো চোখে লেগে থাক
অপমৃত্যুর অশৌচ।

করোনার লড়াই

অসিত মাহাত

আজি এ বিশ্ব মাঝে, মানব জাতি ..জেগে,
জীবন মোদের রহিয়াছে সংকটে।
চারিদিকে করোনা, ঘর ছেড়ে যেও না,
যদি যাও, মাস্ক দিবে মুখে।।
চারিদিকে হাহাকার, করোনার দুরাচার,
সাবান দিয়ে হাত ধোও, হাতে সেনিটাইজার নাও
থেকো সবাই মিটার দু-এক দূরে।।
আতঙ্ক না ছড়িয়ে, বুকেতে সাহস নিয়ে,
করোনাকে ভাবো মনে মনে।
সর্দি, কাশি, জ্বর হলে, চলে যাও হসপিটালে।
ওষুধ খেয়ে থেকো নিয়ম মেনে।।
কোভিডটা টেষ্ট করে, ফিরে এসো নিজ ঘরে,
পজেটিভ হলে থেকো কোয়ারিনটাইনে।
নিজে সচেতন হও, অপরে চেতনা দাও
এ নিয়ম সবাই যেন মানে।।
এস সবাই শপথ করি, ছলচাতুরি নাহি করি
অসিত মাহাত ভনে।
তাহলেই বাঁচিবে দেশ, করোনা হইবে শেষ
(বাঁচবে) বাঁচো সবাই আনন্দিত মনে।।

Once in a Sullen Sal Hurst

Anirban Mahato

As eclipse condescends,
A newish world appears at night.
The branches are lightly hollow,
Pendulous and still leaves
Verdant in verdurous arbour;
A silent bed with fallen leaves
Upon the floors of the forest's need.
So still sal, so balsamic,
So bourgeois, so toned down.
Alteration of epoch,
From one by one
From the spring of winter
To Summer's fall.
A new birth on the air,
A fawn traces mother
Quests her amenities,
In bourgeois sal.
And the tacit hurst,
Where sometimes at night
All of a sudden the fire
Enkindles everything.
But then like sorcery
Great mother fetches rain.
And the clop of nature,
"The assertion to survive"
Likewise a song
A desert lullaby,
Where the embodied souls of wood
All gropes the untreaty.
And dulcet spruce
Woodland night.
Its imperishable rug
The fervor here, glaring
Even in this darkest territory
At night.

মমি ও বালক

চয়ন রায়

নিশ্চিন্ত নিদ্রায় বালক
মমির পাশে শুয়ে আছে
নিদ্রাবস্থায় অমর্ত্য বিস্ময়, মুগ্ধতা

প্রহরীর প্রহরা ওই জাদুঘরের ওই আঁধারে
ওই আঁধারের এমন স্পর্শ এমন মুহূর্তে
এসো এসো। এসো
নদীটিকে ঝাপটিয়া ধরি
গভীর নীলজলে বহুজন্মের অস্তিত্ব

পাহাড় চূড়ায় সহসা উদিত হৈল
এক যোগসূত্র, একস্বপ্নিল স্তর
কোন শব্দ ছিল না তবুও ওই ফিস্‌ফিস্
মমি ও বালকের
ধন্য ওই জীবন, যৌথ এই যাপন

খবর
মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী

দাবানলের লেলিহান শিখার মায়াবী আলো এখনো দৃশ্যমান
অসহায় কঙ্কালগুলো বাটি হাতে রাস্তার ধারে
অদৃশ্য কালো হাতের স্পর্শ পেতে আকুল।
দিন যায় রাত আসে, ব্যাস্ত সমাজ চোখ বুজে খিলখিল করে হাসে।

খবর রাখেনা কেউ।

জানি, তোমাকে আসতেই হত।
কাজ থেকে ফিরে মুনিশ রথু হয়েছে বিকলাঙ্গ।
রামধনু রঙে মাতোয়ারা সমাজ,
সবুজ দেখতে ছুটে যায় কাদামাখা আঁকা বাঁকা লাল মেঠো পথ বেয়ে।

ফিরেও তাকায় না আর।

দুলালী তার ছেলেটারে বুঁচকি বেঁধে-রুয়া করে নিমাইয়ের জমিটাতে,
ভাতে নুন দিয়ে আমড়া মেখে-খায় জন্ডিসে ভোগা রূপচাঁদ শবর।
মনিকার শরীরে আঁচড়কাটার দগদগে ঘায়ে ওষুধ পড়েনি এতটুকুও।

অনেক দূর হতে বাবুরা আইছে খবরের সন্ধানে।
প্যান্ট শার্ট পরা আমার বিমলকে একথা সেকথা শুধায় আর ছবি করে,
একশো টাকার বেগুনী নোটটা দিয়ে বলে যায় কোন খবর থাকলে দিও কিন্তু।

স্বপ্ন
চিত্ত মন্ডল

আবছা রাতের জ্যোৎস্নায়
জাম পলাশের তলায় —
তার আলিঙ্গনের ছোঁয়ায়
ভুলে গেছি ঘর বাড়ি।
কাঁসাই এর টুকরো টুকরো
কল্লোচ্ছাসের ফাঁকে
তার নগ্ন ঠোঁটের চুম্বনে
ফেলে আসা সুখ, দুলে উঠে গোপনে।
ঘুম ভাঙ্গতেই উঠে দেখি, নোনা আঁখি
স্বপ্ন সুখ ভেসে যায় —
বিষমাখা জীবনের কোলাহলে
ছুটে আসে, ভোরের সকাল।

বিদ্যাসাগর
সমীরণ দত্ত

বীরসিংহের সিংহ তুমি জন্ম গরিব ঘরে,
পিতা ঠাকুরদাস আর মাতা ভগবতীর বরে।
গরিব হয়েও দুঃখী জনে করলে অশেষ দান,
মানব প্রেমের বন্ধু সেজে রাখলে তাদের মান।।

বাল-বিবাহ করতে রোধন, ভাঙলে চক্রদুষ্ট,
আগল ভেঙ্গে খুললে দুয়ার, সমাজপতি রুষ্ট।
বিধবাদের বিয়ে দিতে, করলে কত সংগ্রাম,
পরাশর বাণ ছুঁড়লে তুমি রাখলে জয়ের নাম।।

নারীশিক্ষার মহান ব্রতে শিক্ষায় দিলে যতন,
আপ্ততেজের মশাল জ্বেলে আনলে হৃদয় রতন।
নির্ভিক তুমি সকল কাজে বিপ্লবী এক যোদ্ধা,
বঙ্গপটে চিরপৌরুষ বীর সুমহান বোদ্ধা।।

জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে আলো দেখাও শিশুর ভোরে,
সহজ করে বর্ণ চেনাও মনের ভয় দূর করে।
কথামালার কথাকলি দিলে তাদের হাতে,
বাণীর সুমন বোধোদয়ে, সবার হৃদয় মাতে।

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর জ্ঞানের সাগর তুমি,
তিন সাগরে মিলন তীর্থ তোমার জন্মভূমি।
ঈশ্বরচন্দ্র রূপে দেখি জগৎ জুড়ে আছো,
সবার প্রাণে আলোক দ্যুতি হৃদকমলে বাঁচো।।

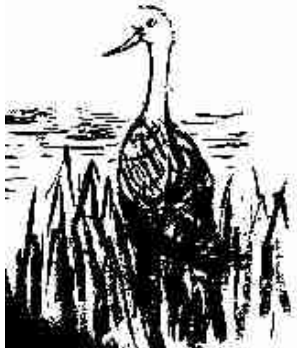

ও নদী রে
মৃত্যুঞ্জয় দাস

নদী তুই থামবি একটু ?
অনেক কথা জানার আছে
নীরবতা নিয়ে কেমনে চলিস
অভিযোগ নেই কারো কাছে ?
ভোরের আলোয় সিঁদুর পরে
কার আশাতে প্রহর গুনিস ?
আবছা আলোয় গাইলে কোকিল
উদাস হয়ে সে গান শুনিস ?
দুলিয়ে কোমর ছলাৎ ছলাৎ
ব্যস্ত হয়ে কোথায় যাস ?
কেউ কি আছে পথ চেয়ে তোর
তোর চোখে যার সর্বনাশ !
দিনের বেলায় কনক মাখিস
রাতে সাজিস রজত সাজে
মাঝে মাঝে শ্যওলা সবুজ
ঘোমটা পরিস কিসের লাজে ?
বাঁধলে তোকে ফুঁসিস রাগে
কার বিরহ মনে জাগে ?
প্রিয়জন থেকে আড়াল হলে
বলনা নদী কেমন লাগে ?
ভাঙ্গিস বাঁধন ভাঙ্গিস তীর
মনের মাঝে উতাল ঢেউ
অস্থির বুঝি আমি তোর
বুঝেনা সেটা অন্য কেউ।।

মৃত্যু
সাঁঝবাতি পাল

মৃত্যুকে তুমি দেখেছ পলাশ ?
সে কোনো অশরীরী নয় নিঃসন্দেহে!
কেমন যেন শান্ত একটা বেশ,
ওর হঠাৎ পায়ের আওয়াজে
ঘুম পায় খুব।
নিঃশব্দে হাত বুলিয়ে দেয় মাথায়,
বড্ড শান্তির....
ঠোঁট দিয়ে গলে পড়ে অভিমান
জড়িয়ে ধরার ইচ্ছেরা,
জেগে ওঠে শেষবারের মতো....

ঘুম আসতে আসতে দুচোখে
তুমি দ্যাখো সন্ধ্যে নেমেছে আকাশে,
শীতের সন্ধ্যে....
আর ল্যাম্পপোস্টের তারে বসে আছে
সব কাকের দল,

যারা এতদিন উড়ছিল তোমার চারপাশে।।

শব্দের কোলাহলে
দেবব্রত দত্ত

শব্দ কিছু জব্দ করে হঠাৎ করেই
হঠাৎ করেই ভাবতে শেখায় শব্দ কিছু,
আমি যখন আর পারিনা, হই নাজেহাল
বলি তাদের, ছাড় না এবার আমার পিছু!

শব্দ কিছু বেয়াড়া বড়ই শোনে না কথা
শোনায় কথা এমন কিছু যেন সে আমার,
শব্দেরা সব জব্দ করে শব্দ দিয়েই, যেন
ওদের কোন কথা শোনার নেই দায়ভার!

আমিও আমার ইচ্ছে মতোন শব্দ সাজাই
একেক ঘরে রাখি তাদের আলাদা করে,
দুঃখ যখন মন ছুঁয়ে যায় একলা রাতে
নোনা জলে ভেজাই ভীষণ আদর ভরে!

যে শব্দ সব, সুখ এঁকে দেয় সন্ধেবেলায়
হুল্লোড়ে ফের হারিয়েও যায় এক লহমায়
শব্দেরা সব জব্দ করার খেলায় মাতে
নৈঃশব্দের মিছিল তখন মান্দাস বায়।

জীবনভর বুকের মধ্যে যে শব্দেরা মৌন থাকে
ঘর ভাঙবার ভয়ে যারা বেরোয় না আর,
খোলা জানলা তারাও তো চায় একটু খানি
যদি মন্দ বাতাস লাগে লাগুক সে দায় আমার।

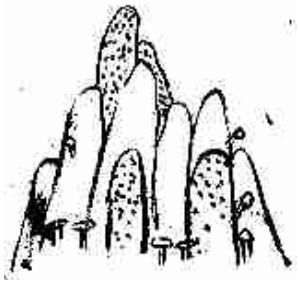

You Have Returned After A Long Gap
Rakesh Arya

You have returned after a Long Gap
With blossoms from 'His Garden'
That is showering upon the earth
A mesmerizing purfume.

Having bathed in this fragrance
Bees are buzzing constant,
Little children from the huts
Coming out with a yell.

For hours from the trees
Spirited cuckoos have been whistling
In the midst of echoing green
Children are running in glee.

You have returned after a long gap
With blossoms from' His Garden'
Take away from the mind of people
A thick veil of gloominess.

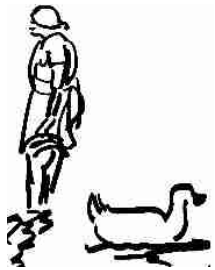

মায়াছন্ন দৃষ্টি
কৃষ্ণেন্দু দাস

ছন্নছাড়া জীবনে,
ভাবনার অন্তহীন উৎসার নিয়ে
অবুঝ, জান্তব মানুষের
নিজেকে গোছানোর
অর্থহীন প্রতিযোগিতা।
বদলে যাওয়া সময়
বদলায় দৃষ্টিও।
তবু,
দিগভ্রান্ত সত্তা শান্তি খুঁজেই চলে,
মন-মজানো নানান কৃত্রিম খেলনায়।
জন্মলগ্নের নিষ্পাপ কান্না থেকে
শেষ বেলার প্রজ্জ্বলিত ব্যর্থ চিতা অবধি,
অচিনই থেকে যায় পরম আপন
অনাদি সনাতন সত্তা।।

স্বপ্নকাঁথা
মৌপর্ণা মুখোপাধ্যায়

অনেক স্বপ্ন বুনতে বুনতে একসময়
একটি কাঁথা তৈরি হয়ে যায়,
অজস্র রঙিন সুতোর কারিকুরি আঁকা,
কত ছবি ভেসে ওঠে
ধান বোঝাই গরুর গাড়ি,
মাটির বাড়ি,
গ্রাম্য গৃহবধূর কলসি কাঁখে যাত্রা
অথবা চাষিভাই দের অক্লান্ত পরিশ্রম।
দিনের শেষে এই আমার সম্বল
কি অসম্ভব ধনী হয়ে যাচ্ছি দিন দিন।

জীবন আলেখ্য
মনতোষ মন্ডল

গুপ্তপথে মেঘভর্তি আলাপন-
ঝিরিঝিরি বর্ষণের অভিপ্রায়।

তেষ্টা কি ক্ষান্ত জগতে... ?
আলো-বাতাসে কি নেমেছে হত্যা ?

কল্পনা, বাস্তবের তপ্ত বারুদ-
নেশা, চোখভর্তি সানগ্লাসে...

হঠাৎ করে আঁকছে না পথ...
কোন কিছুই বদলাচ্ছে না সময় !

আধো আধো কথায় জীবন ফেরী-
অভ্রান্ত দিক দর্শনেই, শান্ত মন।।

নিপাত যাক বর্বরতা
প্রণব মাহাত

বাসনার চোরা স্রোত সিঁদ কাটে
মস্তিষ্কের ঘরে,
ইস্পাত সম খুলি ভেদ করে জন্ম নেয় আসক্তি
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শক্ত বেষ্টনী ভেদ করে
আঘ্রাণ নিতে চায় সে...
আস্তিক মনে সযত্নে লালিত ভক্তি
উন্মূলিত আজ।
মস্তিষ্কের আজ্ঞা পালনে অস্বীকার করে মন
হৃদয়ের দরজায় টোকা মারে বাসনা,
সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ে বর্বরতা
যা রক্ত বীজে বাহিত যুগ যুগান্তর ধরে।
উষ্ণ শোণিত ধারা ধমনী ভেদ করে মুক্ত হতে চায়
লালসার তীক্ষ্ণ দাঁত ছোবল মারে মানবতায়,
আরম্ভ হয় বর্বরতার তুমুল উল্লাস
উচ্চস্বরে ধ্বনিত হয় কর্কশ কল্লোল।
তীক্ষ্ণ তৃষ্ণা নিষ্ঠুরভাবে ঝরে পড়ে কুট্‌মলের বুকে,
ছটফট করে মরে সহিষ্ণু সম্ভ্রম
দুর্বার দুরাত্মার দৌরাত্ম্যে নিস্তেজ দগ্ধানন নারী...
বাসনার প্রান্তরে অঝোরে কাঁদে প্রণয় !
শিক্ষার চিক্কণ উষ্ণীষ ভূপতিত...
নিপাত যাক বর্বরতা,
অঙ্কুরিত হোক মানবতা,
বাঁচুক মমতা হৃদয়ে, মস্তিষ্কে, মননে।

এক মুঠো রোদ্দুর
প্রবীর কুমার দত্ত

একমুঠো সোনালী রোদ্দুর
শোভা পায় আকাশের গায়,
দূর থেকে ভেসে আসে পাখিদের গান
সবুজ সবুজ কিনারায়।
সময়ের আহ্বানে বুক ওঠে প্রকৃতির
জ্বলজ্বলে খুশী মুখ পাতায় পাতায়,
পাখীরাও গেয়ে যায় গান
অবুঝ গম্বুজ সাহারায়।

অব্যক্ত কাহিনী
বুদ্ধদেব মাহাত

আঙুলের রেখা সাক্ষী রেখে প্রথম গণিত চর্চা
ক্রমে সরল সিঁড়িভাঙা বর্গমূল ঘনমূল অনায়াসে সব সমাধান করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।
ঠিক যেন মূলরোম অজান্তেই কান্ডরোমের দায়িত্ব নিয়ে ফেলে
কান্ডরোমের অনেক স্বপ্ন পূরণের পশ্চাতে মূলরোম।
আসলে সম্পর্কগুলিও সেরকম
দায়িত্ব আর স্থায়িত্ব উভয়ই পরিপূরক।
অভ্যাসের বশে বিরুৎ আকর্ষ অবলম্বন করে বৃক্ষ হতে চায়
কালক্রমে দেখে বৃদ্ধি শুধু পতনের নামান্তর।

চল আবার ফিরে যাই
সুব্রত দাস

চল আবার ফিরে যাই সেই লগ্নে
ব্রহ্মাণ্ড শুরুর সেই প্রজন্মে
আবার প্রবেশ করি জঠরে
নিঃষ্পাপ পৃথিবী দেখার আশায়,
খেলা করি গিয়ে ধ্রুব তারার সাথে
ছায়া পথের অলিন্দে।
তারপর না হয় আবার আসবো ফিরে
হেঁটে বেড়াবো সবুজ ঘাসের উপর
দোল খাওয়া সোনা ধান দেখবো।
দেখবো বিষহীন নদীতে মাছেদের মেলা
উঠোনে উঠোনে শুঁকবো সিজানো ধানের গন্ধ
দেখবো নিঃষ্পাপ শিশুদের খেলা,
ধরবো লালপেড়ে মায়ের আঁচল
দেখবো সান্ধ্য প্রদীপের শিখা সাঁঝের বেলা।।

তরল শোক
মানবেন্দ্র পাত্র

তরল আগুন তোমায় ভিক্ষে দিলাম

এই অসময়ে সবুজ-হলুদডানা
উড়ে গেছে মন্বন্তরে।

জলের কথক এক
রোজ এসে পড়ে যায় শাঁস।
মাটির কলসি ডোবে
নদী ঘাট খুলে রাখি, আমার বুকের মাঝে
জল এস বেজে যায় সরল এককে।

তোমাকে দিলাম আমি
আমার নদী

তরল আগুনে যদি পুড়াও সাদা-শঙ্খমায়া
দেখোতো...
আমার হাড়ের কণায়;
হলুদ হলুদ কণায়;
সবুজ সবুজ আয়ু—
কতটা দিলাম।

প্রতিভাস ফিরে গেছ
জানি

আমার আগুন আমি কি করে নেভাই !

হৃদয়ের গর্ভগৃহে জাগে ঝাড়গ্রাম

পিয়াসা ভট্টাচার্য দাশগুপ্ত

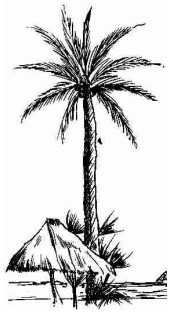

স্বপ্নে দেখেছিলাম ওই রাঙ্গামাটির পথ,
কত লক্ষ বার হেঁটেছি
সেই পথে,
শাল সেগুনের শান্ত
শীতল ছায়ায়।
একটুখানি মাটিও জুটেছিল –
কষ্ট করে একটা
ঘর বানিয়ে ছিলাম।
সময় পেলেই একমনে
লাগিয়ে গেছি গাছ,
এক কণা মাটিও
ছাড়িনি কিছু তে।
পৃথিবী যে বড়
ভালবেসে দিয়েছিল।
গাছেদের সাথে গভীর
আত্মীয়তাও হল—
সুখে দুঃখে ওরা
জড়িয়ে ধরত বুকে।
সেই স্বপ্নের চিতা
সাজনো হল-
মুখাগ্নিও করে এলাম
একদিন।

বাড়িটা আমার চাঁদ
হয়ে গেল
চাঁপা, চন্দন, মেহগিনি কোলে,
আমি হয়ে গেলাম
ছোট্ট একটা বিন্দু,
আর নোনা জলে ভেসে গেল
আমার রাঙ্গামাটির পথ।
আমি তবু প্রত্যহ হাঁটি সেই পথে,
মনে মনে
রাতদিন দিনরাত।
ঝরা পাতাদের দুঃখে
শাল ফুল শুয়ে থাকে পথে,
দুহাতে কুড়িয়ে নিয়ে
মাথায় ঠেকাই।
হৃদয়ের গর্ভগৃহে
জাগে ঝাড়গ্রাম,
রাতভর বাজে শুনি
ধামসা মাদল।।

গরীব

রাজেশ মাহাত

মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে
একাধিক মানুষের ভিড়ে।
ছিন্ন ভিন্ন শরীর নিয়ে পড়ে থাকে রাস্তার কোনো কোণে।
তারা স্বপ্ন ছাড়াই বেঁচে থাকে এই
পৃথিবীতে গরীব মানুষ হয়ে।।
তাদের ঘরের ছাউনি এই মহাকাশের তারা,
শীতের কাছে তাদের জীবন দুঃস্বপ্নে মোড়া।।
তারা সব কিছুকে হারিয়ে লড়াই করতে জানে,
সাহায্যের হাত বাড়ালে তারাও হাসতে জানে।
অবসন্ন তাদের শরীর ধুলোর কলঙ্কে ভরা,
এসো আজ হাত বাড়িয়ে তাদের হাত ধরা।

অলীক কল্পনা

আশিস দত্ত

যে গোধূলীলগ্নে ময়ূরকণ্ঠী সালোয়ারে
তোমাকে দেখে প্রথমবার
চক্ষুস্থির হয়েছিল আমার,
হয়তো দীর্ঘ প্রতীক্ষার
ঘটেছিল অবসান তখনই।
হয়তো আমার নয়ন যুগল খুঁজছিল
তোমাকেই।
ভরসা পেয়েছিলাম তোমার দুচোখেও।।

তোমার কুন্তলে হার মানাতে চেয়েছিলাম
শ্রাবণের কৃষ্ণ মেঘকে।
তোমার প্রশস্ত ললাটে বসাতে চেয়েছিলাম
অস্তমিত রক্তিম সূর্য।
তোমার দুচোখের আঁখি জুড়ে দেখতে চেয়েছিলাম
নীল সমুদ্রের বিশাল গভীরতা।
তোমার সীমন্তে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম
আমারই অস্তিত্বের প্রতীক।
তোমার মনিবন্ধে বাঁধতে চেয়েছিলাম
নকসা খচিত শ্বেতশুভ্র শাঁখা।
তোমার হৃদয়ে তুলতে চেয়েছিলাম
উড়িষ্যার সুপার সাইক্লোন।।

কিন্তু হায়!
সহস্র পদাঘাত হেনেছ আমার সে
অলীক কল্পনায়।
স্বপ্ন বস্ত্রে দেহ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টায়
হতে চেয়েছ 'মডার্ন'
টপলেস্ ফ্যাশনের ইঁদুর দৌড়ে
সামিল করেছ নিজেকে।
তোমার পিপাসু চোখ খুঁজছে
আমাকে নয়— অন্য কাউকে।।

এ রূপ, এ শীতলতা

রাজা ভট্টাচার্য

তোমায় ছুঁলে
অনন্ত সবুজ হয়ে যায় মানসী
ঠোঁট থেকে ঝরে পড়ে কৃষিকাজ

তোমায় ভালবেসেছি বলে
পোকায় কেটে দিয়ে গেছে নতুন ধান
বর্ণমালা সাজিয়ে বসে আছি
শরীর ছুঁয়ে নেমে গেছে অতল

শস্যক্ষেত কেঁদেছে অন্তহীন
তুমি অন্তরীন হয়েছ সবুজ
বাউল চলে যাবার পর দেখ
একতারাটি ফিরে এসেছে আবার
তোমার সবুজ শাড়ি, টিয়া ডাক
আর নতুন জন্মের জন্য

চলো প্রেমে পড়ি, আবার।

দিনান্তে
সুমন রায়

তার গভীর চোখে কাজল পরিয়ে দেওয়ার
যে কেউ নেই
তার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হওয়ার বন্য বন্য
সে সুখ অধরাই
মুখ ফিরিয়ে ব্যস্ত জনপদ, কারখানার বাঁশি
প্রগলভ লোক্যাল ট্রেনের কথাকলির সুর
তবুতো জেগে আছি ভিক্টোরিয়ার মতো
দূষণ মাপতে প্রতিদিন
নিতান্ত এ দিনের আয়োজনে কতদিন
রোদ চশমায় দেখিনি তোমায়
কল্লোলিনী, কত প্রহর নিদ্রাহীন
নির্নিমেষে চেয়ে থাকা আকাশের
সুনীল হাতে একমুঠো ফুল রেখে
নিঃশব্দ শহর এখন ঘুমোতে যায়
প্রতিরাতে অবিশ্রান্ত একঘুম
শববাহী গাড়ি তার মৃত্যুমুখ
তুলে বলে শ্লো গানে
এ প্লাবনে, ঝঞ্ঝায় যুথবদ্ধ
হই এসো মুষ্ঠিবদ্ধ প্রেমময়তায়
এসো মন খারাপের গল্প করি
শাশ্বত সে শ্রবণ তবু
বন্ধু হয়ে রবে দিনান্তে।

বিস্ফোরণের পরে
শাশ্বতী হোসেন

সীমান্ত মাটি শোণিত গদ্যে লাল
ক্রুজ মিসাইল বেওয়ারিশ ইতিহাস
শকুন-শিয়াল তামাম গ্যাং-এর রাজা।

আজকে যখন হাতের মুঠোয় অস্ত্র
যুদ্ধ থামাও তোমার কণ্ঠস্বর
বেঁচে মরে থাকা! এ-ও মৃত্যুর সাজা।

সেনানিবাসের চৌদিকে টহলদার
গোপনে গোপনে জেহাদি মৌলবাদ
সীসের বুলেটে বাতাস গর্জে ওঠে।

শহীদ জওয়ান এখন মাংসস্তূপ
সীমান্তে বাড়ে শরণার্থীর চাপ
পৃথিবী নুব্জ, ক্ষয়িত যুদ্ধবাজেটে।

কী অন্যায় ছিল নিরস্ত্র মানুষের ?
কী হিংসা ছিল নির্মম শ্বাপদের ?
ক্লেশিত সমাজ ক্ষুধা কান্নার দেশে ?

খেও না তোমার নরখাদকের বিষ
যুদ্ধ বিরোধী শ্লোগান ওঠাও রাজা
হাজার বুকে কাঁদছে শহীদ ছেলে

লাখ লাখ চোখ মরা ঈশ্বর দেখে
শত বছরের শত যুদ্ধের শেষে।

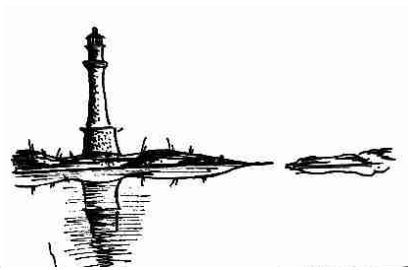

উৎসর্গ
শঙ্খশুভ্র পাত্র

উৎসর্গ-অনুমতি, মধ্যে এক মুগ্ধ সরোবর।
জলকেলি, রাজহংসী, বংশীধ্বনি, স্তনিত দুপুর...
অবরেসবরে এই স্বপ্ন দেখে নিদ্রা তথাগত
যে-তুমি বীরণবাসে চিরদিনই অন্তঃবাসীপুর।

হাসি বড়ো উপাদেয়। বাসি হলে চিন্তার বিষয়।
'ভালোবাসি', উপরন্তু সহজে কি বলা যায় 'আলো' ?
তুমি না দামিনী হলে, দাম কই তাবৎ লেখার !
শিরা-উপশিরা জুড়ে এত অগ্নি আমাতে কি সয় ?

উৎসর্গ-স্বর্গাদপি,শূন্যস্থানে সরস্বতী নদী
নামে কী-বা আসে যায়— অনুমতিহীন তাকে ভাবি,
দাবি কি সহজে মেটে ? কথায়-কথায় ওই যদি-
দ্বিধাভরে চেয়ে থাকে, কী হবে তালিকা, তালাচাবি ?

লেখা ভারি স্পর্শাতুর, একা-একা নিঝুম দালান
কে বা খুঁজে পায় তাকে, অলক্ষিতে, গান শুধু গান...

তোমাতেই আমি
সৌমেন্দ্র নাথ মাহাত

সেরে যাবে শতেক ঘা মুছে যাবে ক্ষত
প্রাণটা একদিন তো সবারই যাবে
যাওয়ার বেলায় কে বুকে আগলাবে ?
ভুলে যাবে দুঃখভরা স্মৃতি আছে যত।
মাটির টানে মায়ার টানে পাদপের মত,
মূল দিয়ে মাটিরই রস শুষে খাবে,
আঁকড়ে ধরে সজোরে দৃঢ় ঋজুভাবে।
মস্তক আকাশ পানে তবু অনুগত।
নিশ্চিন্তে ঘুমাই রাতে, উঠে পড়ি প্রাতে,
তোমার কুসুম দিই তোমার পূজাতে।
জ্বালায়েছ প্রাণ শিখা, জোগাও ইন্ধন
কামনা জর্জর আর বিষয় বাসনা,
অদৃশ্য শক্তিতে ভরা তৃপ্তিহীন মন।
বাসা বাঁধি সে তরুতে তুমি তো আসো না !

মনের কথা
অন্তরা মুখোপাধ্যায়

এখন তুমি ভালো আছো ?
মুখের মধ্যে হাসি নিয়ে
নিত্য বাঁচো ?
সকালবেলা হাঁটতে যেয়ে
জামাকাপড় ঘেমে নেয়ে
হাতটা ধরো কার ?

মাঠের মধ্যে বৃষ্টি এলে
একটা ছাতা দুজন ধরে
দাঁড়িয়ে থাকো আর ?

মেলার সময় দুজন মিলে,
আইসক্রিম ভাগ করে,
অন্ধকারে হারিয়ে যাও আর ?

সন্ধেবেলায় গাড়ির ভেতর
অনেক দূরে যাবার সময়,
সঙ্গী হয় কে ?

প্রশ্নগুলো এলোমেলো,
সুযোগ পেলে গুছিয়ে নিয়ো
গানবাজনা সুরের ছন্দে,
তুমি থাকো মহানন্দে।

জাহান্নামের ঘোড়া
গৌতম মাহাতো

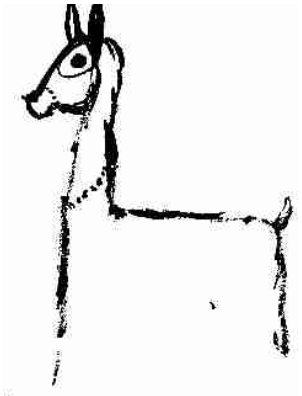

এই পৃথিবী —
এ জীবন
বড় ছোট মনে হয় আজকাল হাওয়া
সার্কাস
হু হু ছুটে যায় রাতের শাবক
ওই... ওই তো
পালকের আরাম খোদিত হয় মকসো ছায়ায়
কে কার দায় নেয়-কে জানে 'কলহ বিরাম'

খানিক পরই শোনা যাবে দিনের দস্তক
আলো এসে বলবে আবার- কই লো সংসার,
এঁটো যা সব কলতলায় দিয়ে যা...

''আলো ডোম্বী তো এ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাগ।।''

প্রচেষ্টা এডুটেক
অনুরাধা কর্মকার (রানা)

মনে কখনো ভাবিনি যে আসব তোমার দ্বারে,
হঠাৎই কেমন করে এসে যাই তোমার প্রতিষ্ঠানে।
প্রথমে এসে তোমার দ্বারে, দেখে আমার মন অবাক হয়েছে,
কত সুন্দর সারিবদ্ধভাবে বসে, ছেলেমেয়েরা ক্লাস করছে।
প্রথমে শিক্ষকদের দেখে একটু লেগেছিল ভয়,
কিন্তু প্রতিদিন পড়া দিতে দিতে এই পড়ার মধ্য দিয়েই
ভয়কে করে ছিলাম জয়।
পড়তে পড়তে পড়া হল, জানতে জানতে অজানাকে হল জানা
আমার মনে,
জানলাম যে এই প্রতিষ্ঠানেরও একটা সুন্দরময় জগৎ রয়েছে,
এই সুন্দরময় জগৎ নিয়ে আমাদের সকলকে গ্রহণ করেছে।
এই সুন্দরময় জগৎ থেকে ভালোবাসা উজাড় করে আমাদের
চলতে শিখিয়েছে,
সহযোগিতার জন্য বার বার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।
চলার পথে বার বার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেও আমাদের
ঘুরে দাঁড়াতে শিখিয়েছে,
সে হল আর কেউ না, আমাদের ছোট্ট শিক্ষালয়—
প্রচেষ্টা এডুটেক।

বঅইন্যা
রাজুরানা দাস

বঅইন্যা হঞেছে না পূজা হঞেছে
ই লিয়েই তো গন্ডগোল বাপ।
ই বঅইলছে পূজা কইরবঅ তো উ বঅইলছে
ত্রাণে টাকা দিব
কেও কারু কথা শুইনছে নাইখ
লে ইখন কি কইরবি কর ?
রকতের হড়পা বানে ভাইসে গেলেক পাড়া
থিকলে গাঁ-গঞ্জ শহর
কুথায় রাইখব্য পা ?
জল ছুইটছে ঘর ডুইঞছে
চমক্যে উইঠছে ছা।
বাপ কাঁইদছে মা কাঁইদছে
এক লহময় উজার হছে গাঁ।
ইমন জল খল খল করে ঢুইকছে
বাঁধ দিলেও শালা থাইকছে নাইখ।
মাথার ভিতর ঘুরঘোরা পোঁকা ঘাঞিইছে
বুইঝতে লারছি
কেমন কইরেএ বঅইন্যা হঞেল
বৃষ্টির জল নঅ মানষের জলে।

ভালোবাসার তরে
পীযূষ প্রতিহার

আমার সঙ্গে ঘর বাঁধবে বলে
পঁচিশ বছরের আরাম বাড়ি ছেড়ে
যেদিন বেরিয়ে এলে-
সকল বাধা কাটল সেদিন
ভালবাসা ভাঙল সেদিন
ভালোবাসার তরে।

একের তরে আরেক মরে
হৃদয় জুড়ে প্রেমের জ্বরে
সকল তুচ্ছ করে।
স্বপ্ন ছিল আশা ছিল
সব হারানোর ব্যথা ছিল
সকল পাবার তরে।

ঘর ছেড়ে সেই অচিন পথে
অনিশ্চিতের ভবিষ্যতে
ভাসিয়ে দিলাম তরী,
দুজনারই ভরসা আছে
পৌঁছে যাবো তীরের কাছে
কাটবে বিভাবরী।

রবীন্দ্রনগর
স্বর্ণেন্দু সেনগুপ্ত

ভাষা তার অধিক আকাশে নেমে যায়
গানের পরম গীতি আজ থেকে কানের আধার
এই সবে ছেড়ে যায় রবীন্দ্রনগর, যেখানে সকাল হলে
বিবাহের সব আলো ধুয়ে মুছে যাবে

কখনো পথের পাশে মিলেমিশে যেতে পারে জুতোর রাবার
এখানে সবাই যারা কথাগুলো শোনে, তাদের বুকের মাঝে
ঝুলে আছে ঠাকুরের ছবি, একটি গানের আগে
একটি গানের পরে, রবীন্দ্রনগরে।

পায়েল সমুদ্র
সুকমল বসু

সে বলেছিল আমার শরীরে
ঝর্ণা আছে সমুদ্র আছে লবণ আছে
আমি হাঙরের মত শুনেছিলাম।

বিশ্বাস করো তার নুন সমুদ্র দেখার আগেই
একটা ছায়া তাকে নিয়ে গেল
বাতাস গুহার অন্দরে
সেখানে সে মুক্ত হতে হতে
মুক্ত হতে হতে

আর আমি এই অগ্নিকারাগারে
যুক্ত হতে হতে
যুক্ত হতে হতে

কেউ কাউকে আর দেখতে পেলাম না।

বৈপরীত্য
রিম্পা ষড়ংগী

দুরন্ত এক বৃষ্টি দুপুর
শিশুর হাতে ঘুড়ি
ঝলমলে মন, উছলে ওঠা
নেই কো কিছুর জুড়ি।।
সরস ছবির দৃশ্যপটে
গ্রামের ছেলেবেলা
উচ্ছাসেরই তীক্ষ্ণ প্রকাশ
বৃষ্টি ঘুড়ির খেলা।
অন্যদিকে শহর শিশু
একলা আপন মনে
ল্যাপটপেতে করছে যে কাজ
অলস দুপুর ক্ষণে।।
নেই ত কিছু আনন্দেরই
মুহূর্তেরই লেশ
একাই শিশু ফোন ও নেটে
একাই কাটায় বেশ।।
হচ্ছে যে শেষ, ছেলেবেলার
সহজ কিছু ছন্দ
মডার্ণ যুগের মডার্নিটি
কেরিয়ারের দ্বন্দ্ব।।

ছোবল
সমীর শীট

আমি একটা কালসাপ পুষেছি,
কিন্তু তাকে বিশ্বাস করিনি
সবসময় দেখেছি শত্রুর চোখে
তাই ঠেসতে দিইনি ধারে কাছে।
আমার মনে ক্রমাগত তার প্রতি জমতে থাকে বিশ্বাস,
জমতে থাকে ভালোবাসা,
তার সুষ্ঠু আচরণে।

তাই একদিন সাত-পাঁচ না ভেবেই
বুকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ি বিছানাতে,

তীব্র যন্ত্রণায় সকালে উঠে দেখি
আমার সারা দেহ নীল করে দিয়েছে তার বিষাক্ত ছোবলে।

পরিণয় প্রতীক্ষা
স্নেহাশীষ দাস (তুফান স্নেহাশীষ)

বাসন্তি রোদ্দুরে, ক্লান্ত যুবতী সূর্যের আলো মাখে।
প্রেমী ? সেতো অসহায় নারী জানি, অশ্রুসিক্ত মুখে।
নদের নিমাই সন্ন্যাস নিল, হল সোনামাখা গোরা।
বিষ্ণুপ্রিয়াও প্রেমহীনা হল, মায়াবিনী মুখচোরা।

গোধূলি বেলায় শ্যামের বাঁশি, প্রেমের বন্যা জানি।
বৃন্দাবনেও বিরহের ধ্বনি, আঁখিজলে রাধারাণী।
চণ্ডীদাসের প্রেম নন্দিনী, রজকিনীও কাঁদে।
কতশত প্রেমী ধুলার দুলালী, জ্যোৎস্না রাতের চাঁদে।

ওদের ওষ্ঠে মধু, কণ্ঠে যে প্রেম, তবুও প্রেমিক হারা-
হৃদমন্দিরে জপে পাগলিনী, মন যে পাগলপারা।
চাওয়া না পাওয়ার অপেক্ষাতেই জাতিস্মরেরা বাঁচে,
জ্বলছে হৃদয়, পুড়ছে পুড়ুক প্রেম-আগুনের আঁচে !

প্রেমের বন্যা পাহাড়ি কন্যা, আনবে শিবের সতী।
সব প্রেমেরাই পরিণতি পাক, হোক সব পার্বতী।

এখন
আশিস অধিকারী

এই মহামারীর আকালে
জ্বলে যাচ্ছে সব...
বাবার মুখাগ্নিটুকু করতে যাবে বলে
ছেলে এখন হাসপাতালের জাঁতাকলে পড়ে আছে।
এমন সময়, সম্পর্কের সুখ দুঃখগুলো— এই
শ্রাবণের ছায়াচ্ছন্ন রোদে শুকোতে দিচ্ছি আমরা।

জ্বলে যাচ্ছে। কুন্ডলী পাকানো ধোঁয়ায়
স্বপ্ন-প্রেম-স্নেহ, এক অসম্ভব বিবেকী মোচড়...
আমরা ফিসফাস করছি, এ-ওর দিকে তাকাচ্ছি
সময় পেলে মেপে নিচ্ছি অক্সিজেনের ওঠানামা।

হায়! এই কালবেলায়
তবে আমরা নীরোর মতো বাঁশি বাজাই, এসো
ভালোবাসার পূর্ণতায় ভরিয়ে দিই, জীবনের
শেষ মুহূর্ত গুলো।

এখনই প্রেমের গান গাওয়ার সঠিক সময়,
মৃত্যুকে থামিয়ে দিয়ে,তাকে প্রশ্ন করা...
প্রেম! যা জীবনের শুরু ও শেষের বর্ণমালার চিঠি
এই মহামারীর আকালে...

মাঠের বুকে দুধ
সোমা প্রধান

গোবর জলে নিকানো উঠোন
একপাশে তার খড়ের গাদা, মরাই
বাঁশের খুঁটি, তুলসিতলা আল্পনা দেয়
আতপ চাল আর সব্জী ভরা সরা।

পুকুর পাড়ে বাঁশের ঝাড়,
হাওয়ায় দোলে, কিশোরী এক শ্যামলা
চাঁই এর ঘাটে এঁটো বাসন
গল্প করে কই পুঁটি আর কাতলা।

রাঙামাটির পথে ছায়া
বিছিয়ে রাখে আঁচল পাতা ভোর
খেজুর রসে ডুবিয়ে ঠোঁট
শীত এঁকেছে প্রেম, হৃদয়ে তোর।

আলের ধারে মেঠো সুর,
নালায় ভরা জল,আফসোস
গড়িয়ে যায় মাঠের বুকের দুধ
নাড়ায় পোড়ে গতজন্মের দোষ।

সব্জী এবং সরষে ক্ষেতে
রং লেগেছে, ফাগুন নাকি ভ্রান্তি
নবান্ন আজ উঠোন জুড়ে
নলেন গুড়ের পিঠে, সংক্রান্তি...

সাধ
নীলেন্দু মাহাত

সাধ জাগে মম অন্তরে-
রইবো না আর বদ্ধ ঘরে,
আসুক যতোই বাধা নিষেধ
তুড়ি মেরে করবো নিকেষ।

সাধ জাগে মন মন্দিরে-
উড়ে বেড়াই আকাশ পরে,
কইবো কথা পাখির সাথে
মেঘমালারে করবো মিতে।

সাধ জাগে মম চিত্ত মাঝে-
দৌড়ে বেড়াই সকাল সাঁঝে,
ঘন সবুজের হাতছানিতে-
হারিয়ে যাবো ভুবন স্রোতে।

সাধ জাগে মোর মনের কোণে-
বৃষ্টি ভেজা বাদল দিনে,
নৌকা চড়ে নদীর বুকে-
হারিয়ে যাবো বৈঠা টানে।

সাধ জাগে মোর হৃদয় পাশে-
মিশে যাবো ফুলের দেশে,
রং বাহারি অলির মতো
কুসুম শোভায় মাতবো ততো।

সাধ জাগে মম অন্তরে
জীবন-মায়া তুচ্ছ করে,
ছোট্ট সোয়ালো-র সুখী রাজপুত্র হয়ে
জগৎ হতে দুঃখ যত, দিই মিলিয়ে।

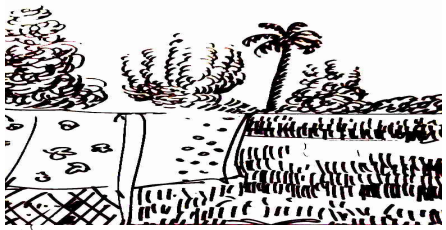

পায়ের নীচে করঞ্জা ফুলের কুঁড়ি
খুকু ভুঞ্যা

সকাল ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে নিচে করঞ্জা ফুলের কুঁড়ি,
ফুলের পাঁজর গুঁড়িয়ে দিতে চাইনি কোনোদিন
তবে ফুল কেন পেতে দেয় বুক
আগুনের হল্কা সরিয়ে বাতাস এনে দেয় বসন্তের নির্যাস
আমি তো আগুন চাই
যেমন চিতার ভেতর দহন নিয়ে নিথর শব
তেমনি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে স্তব্ধ করে,
সূর্য কমল ফোটাতে চাই মাথার ভেতর
কেন ফুল লতা ঘাসে এতো করুণা মমতা পাতা
কাঁটার মালা পরিয়ে দাও ভালোবেসে

গর্ভ থেকে মা ছুঁড়ে দিল আগুনে যেদিন,
ঈশ্বরের সঙ্গে চোখাচুখি
আগুনে এতো প্রেম, এতো মায়া টান—
অথচ সে দেখে আমার মৃতের মতো পুড়ে যাওয়া
এই তো লড়াই
জীবন রেখে অগ্নিরাশির কাছে কিভাবে জেতা যায়
জল মাটি ঘাস কুসুমের কোমলতা
কিভাবে অন্তরে নরম জোসনা বাঁচিয়ে
জীবন জয়ের পতাকা উড়িয়ে দেওয়া
দারুণ জেনেছি তাই
আচমন সারে ঠোঁট অগ্নিজলে।

প্রত্যাখ্যান
অনুষ্কা ঘোষাল

কিছু কিছু প্রত্যাখ্যান চোখের কোণে ভিসুভিয়াসের জন্ম দেয়,
রিক্ততার অন্ধকারে নিমজ্জিত না হয়ে, তা ত্যাগের প্রতীক হয়।

নিজের সঙ্গে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজ ভীষণ প্রগাঢ়,
মিথ্যের সাম্রাজ্যে সত্যের সাংকেতিক আভাস তাই বড্ড গূঢ়।

ব্যর্থ প্রেম আর মোহের মধ্যে গুলিয়ে ফেলা, কিছু অর্থহীন সংজ্ঞা,
প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে তাই কিছু শর্তহীন প্রজ্ঞা।

শেষে আদর্শ বলল, কীসের দুঃখ, কীসের বেদনা, কীসের প্রত্যাখ্যান
আধ্যাত্মিক অনুরাগের ছোঁয়ায় সব হয়ে যাক ম্লান।

প্রতিদিনের কবিতা
বিরূপাক্ষ পন্ডা

অন্যসুখে বাসাবদল দিন যায়
নামতার মতো
কে সুখী কে দুঃখী কে যে মধ্যবর্তী
থেকে যায় পুরু মুখোশে।

আড়ালের সেই গল্পপ
হেঁয়ালি ভেবে
এড়িয়ে যায় সই
বাঁকা পথে চলছে কেউ কেউ
কেমন যেন ন্যাওটা সব।

দুঃসময় তুমি থাকো চিরকাল
সিংহাসনে ভালো সন্ন্যাসী জাল।

অমানুষ
সাগর মাহাত

সারারাত বৃষ্টির মাঝে ব্যাঙেদের সাথে
মিটিং করে জেনেছি, আমি অযোগ্য নই।
আমিও ভালোভাবে বেঁচে থাকার রসদ
খুঁজে নিতে পারি,
টাকা পয়সা নয়, শুধু বাহবাটুকু দরকার।
অথচ কি আশ্চর্য দেখুন,
আপনারা সেটুকু পর্যন্ত দিতে চান না।
আপনারা চান সারাজীবন ভিক্ষা করতে করতে
আপনাদের পায়ের নীচে পড়ে থাকি,
আর সেজন্য সদ্য কোনো বীজ মাথা তুলে দাঁড়ালেই
আপনারা জমি দখল করে কেটে দেন ফসলের মাথা।

বিশ্বাস করুন, ব্যাঙেদের মধ্যেও একতা আছে
তাই বর্ষা শেষে তারা মিলেমিশে নতুন করে ঘর বানায়।
আমাদের মধ্যে একতার বদলে হিংসা থাকায়
আমরা মানুষ হয়েও আজ অমানুষ।

দেওয়া-নেওয়া
অমিত পণ্ডিত

একটি মুচমুচে বিকেল
ডুবে যাচ্ছে এক কাপ চা'য়ে
তখনও পলাশের ঠোঁট
নেভেনি বসন্তের গাঁয়ে

তখনও নদীর উপর অভিমানী সাঁকো
কাছাকাছি অ্যাতো তারা
তবু ছুঁয়ে নাকো

পাহাড় জামা খুলে আঁধার বিলায়
পুরুষেরা যেভাবে নারী'তে মিলায়
যেভাবে ছবি আঁকে বাতাসের গায়ে
পাখিদের ডানাগুলি অবুঝ উপায়ে

তখনও কথারা ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে
নীল থেকে নেশা খসে
পড়েনি লুটিয়ে
তারপরে চাঁদ আসে রূপসী গ্রামেতে
আজ তাকে কে নেবে গো প্রেমের দামেতে...

ঈশ্বর আসবেন
ফিরোজ আখতার

ঈশ্বর আসবেন : তোমার নাভি ও রক্ত থেকে
মৃত মাতৃত্বের স্তূপ থেকে।
কম্পনে কম্পনে নতুন কোনো সভ্যতা উগরে দেবে
প্রমিথিউস : নতুন সভ্যতা ও শূন্যতার বিভাজন রেখায়
দাঁড়িয়ে থাকবে স্থির।

দূরত্ব কতটা ?
মাতৃত্বের নাভির দৈর্ঘ্য যতটা...

গরিবী
ভরত চন্দ্র মাহাত

কি লাভ আমাদের বেঁচে এই পৃথিবীর বুকে
সারা জনম মরছি দুঃখে একিদনও নাই সুখে,
রাতে দিনে খাটছি শুধু গরু গাধার মত,
ক্ষেতে কলে কারখানাতে করতে পরের হিত।
করছি মাটি দেহ খানা
নাই নিজবাড়ি খাট-বিছানা,
পরের দয়ায় পরের দাওয়ায় কিংবা গাছের তলা।
হে ভগবান ! কবে মোদের শেষ হবে দুঃখ ভাবনা।

অলসতা-বিলাসিতা নাই তো কাজে ফাঁকি,
পরের ধন আগলে নিয়ে সদাই সজাগ থাকি।
হুকুম তামিলে দেরি হলে কুবাক্য কশাঘাত।
কপালেতে জুটে মোদের আমরা গরীব জাত।
সুশিক্ষা সভ্যজ্ঞ রুচি,
লোক দেখানো শুদ্ধ শুচি
জানিনা করিনা মিথ্যা ভেদ আর অহংকার।
রোগে-শোকে দেনায় ভরা মোদের যে সংসার।।

চুরি করে পাশ করা আর লোক ঠকানো বাবু,
অন্তরে নাই বিদ্যা দয়া, মানের বড়াই তবু
মানবরূপী পশুরা দেবে, অশান্তি অনল জ্বালে
চিরকালের মান গৌরব ভাসায় আবেগ জলে,
সবকিছু নিঃস্বার্থে দিয়ে
মাটির সঙ্গে যাই মিলিয়ে।
মাটির মায়ের খাঁটি সোনা 'দুনিয়ার মজদুর'।
বে-সুরে তবু জোর গলায় গাহি মুক্তি মায়ের সুর।।

আসা যাওয়াই জীবন

পিয়ালী বেরা

ঘুমন্ত রাত্রির বক্ষ ভেদ করে
দিব্যজ্যোতিতে যে প্রেমের সৃষ্টি,
তাকে ঐশ্বরিক উপখ্যানে হৃদয়ে রেখো নিশিদিন।
সমুদ্র ছুটে আসে চিরকাল বালিয়াড়ি পেরিয়ে
হয়তো তোমারই সন্ধানে...
তুমি তো পলি পড়া নদীর মতো
অভিমান জমিয়ে রাখো হৃদয়ে,
দূরত্ব বাড়াও যোজন যোজন.....
শিশিরে শীতল চুম্বনে
রাতভোর জাপটে থাকা,
প্রভাতে নরম রৌদ্রে ভেজা বৃন্তচ্যুত পুষ্প,
বিরহী দৃষ্টি রাখে আলাপে প্রলাপে ভরানো বৃন্তের দিকে,
পুষ্প ছাড়া বৃন্তের ও যে ব্যর্থ জীবন।
তবুও মেনে নিতে হয়
অবশেষে সব কারণ অপেক্ষাই
জীবনের অন্তবর্তী মানে।

কৃষ্ণকলি

পিকু (তাপস সাঁতরা)

হ, আমি কৃষ্ণকলি বটে
তবে ওই কবিগুরু রবি ঠাকুরের লয় গো
রবি ঠাকুরের লয়
ডোমনি পাড়ার কৃষ্ণকলি বটে।
আসল নামটা তো আমার কাকোলি ডোমি
লক্ষী ডোমি'র মেয়ে।
কিন্তু গায়ের রঙ্গটা হ্যমার ভীষণ কালো কিনা
তাইতো গাঁয়ে কেহ কালী কেহ বা কৃষ্ণকলি বলে ডাকে।

ময়নাপাড়ার কৃষ্ণকলি লই আমি
তার মত ছিল না মোর রূপের ছটা
ছিলনা মোর কালো হরিণ চোখ
বয়স তখন কত হবেক
সবে যৌবনে দিয়েছি পা
রূপের ছটা ছিলনা বটে
শরীর খানা শুধু গেছে বেড়ে

আমার অঙ্গে লাকি বিজলীর ছটা
সবাই ছুতে চায়
কেহ ধরে হাতটা চেপে কেহ বা জাপটায়
কেহ খোঁজে অন্ধগলি কেহ খোঁজে জঙ্গল রাস্তা

ছুঁলে যাদের জাত যেত চলে
তারাও এখন একটু সঙ্গ চায়
বলে, ও কালী
চল না একটু বেড়িয়ে আসি
নির্জন লদি পাড়ে বসে একটু গল্প করবি
তার পর লৌকা চড়বো লদিতে নাইবো সাঁতার কাটবো
তুই একটু কাছে আসবি আর ঘেঁষবি বসে গায়
আমি বললেম, কেনে
যদি গল্প করবে তবে ঘরেতে আসনা কেনে
বাবা-মা থাকবে আরো দুটা লোক বাড়বে
তবে না গল্পটা জমবে
আর গায়ে কেনে ঘেঁষে বসবো
তোদের জাত যাবে না বুঝি
গেল বারে কথা তাহাদের মনে নাই

দুর্গা ঠাকুর ভাসাইনের সময় মোর ভাইটা ঠাকুরটা ছুঁইয়া দিতে
তোরা তাকে নেড়া করে গ্রামের হাটে ঘুরাইলি
মনের দুঃখে ভাইটা মোর গলায় দড়ি নিল
ঠাকুরে যদি জাত যায় রে
তবে তোরা কোন খোঁয়াড়ের হাড়
তুহারাতো ভুলে গেইছিস, তুহাদের মনে নাই
পূজা আইলে মোর বাপ মা'র বুকটা হু হু কাঁদে
আর আইজ তহারা আমায় ছুঁবার লাগি কত বাহানা খুঁজিস
কত সাদিছিস একা একটু নির্জনে পাবার লাগি
কত ছলা কলায় কাছে ডাকিস
বুঝি তুহাদের জাত কি ওই
প্রাণহীন পতিমার বেলায় জাগ্রত হয়।
নারী ছুঁলে যদি তুহাদের জাত না যায়
তবে দুর্গা কেমনে অশুচি হল ?

অবরুদ্ধ

চিত্ত মাহাতো

ক্রমশ অস্থির হচ্ছে এক-একটি দিন
ভেঙ্গে দিচ্ছে সমস্ত বিশ্বাস
খরার আগুন ও বন্যার হাহাকারে
দেখো কেমন শূন্য হয়ে উঠছি
যন্ত্রণায় লাশ হয়ে শুয়ে আছি
বন্ধ হয়েছে আমাদের সহজ ওড়া-উড়ি
আমার চারপাশে যেন কার্ফু
আক্ষেপ নেই সবপথ রুদ্ধ
ভেঙ্গে যায় শৈশবের মেরুদণ্ড
জীবনের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে জীবনের
মুখোমুখি দাঁড়াতেও পারছিনা,
প্রেম ও প্রেমহীন অবেলায়
অন্ধকার মেখে সামনে দাঁড়ায় সমস্ত শোক।

খেলা

তমোঘ্ন মুখোপাধ্যায়

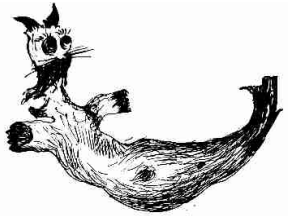

অনন্ত দড়ির ওপর ভারসাম্যের পা কাঁপছে।
পয়সার টুপটাপ শব্দে বিকেল শোনো, শ্রোতা।
এমন দৃশ্যের মধ্যে শুধু পা'টুকুই প্রতিমা হবে।
প্রণামের মূল্য নিয়ে এখনও সংশয়, তবু
অনন্ত দড়ির ওপর ভারসাম্যের পা কিন্তু আগুপিছু জাগাচ্ছে গমন।

বিনিময়ে হাততালির তাঁত। বিনিময়ে আশীর্বাদ, সন্দেহ...
পা কেন শিকড়ের মতো মুহুর্মুহু ছড়িয়ে যাচ্ছে না, এই নিয়ে
কানাঘুষো দড়িপ্রান্ত ভারী করে দেয়।
পতনের ইতিহাস অনেক পুরনো, তবু
বারবার ফিরে ফিরে আসে। বিকেলের কিছু দূরে একা একা
হাসে মৃদু-মৃদু...

অনন্ত পায়ের মাংসে ভারসাম্যের দড়ির কবচ।

এক-একটি জটের গায়ে কত পথ কত আর্তনাদ...

জীবন বুড়ো

মনীষা ঘোষাল (মল্লিক)

একদিন সূর্যাস্তের ছবি আঁকা দেখতে দেখতে
কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিলাম,
আর সেই হারানোর পথে আমার পাশে এসে বসলো কেউ,
পরনে ধূসর বস্ত্র।
কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখলো তার বস্তাঝোলা।
কাল বৈশাখীর এলোচুল আর চোখে প্রশান্ত মহাসাগর।
সুন্দর নয়, তবুও যেন সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইলাম।
একটু দূরে সরে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম— কে তুমি ?
পাহাড়ের প্রতিধ্বনির অট্টহাস্যে বলে— আমি জীবন বুড়ো !
বলি, কী আছে তোমার ঐ ঝোলার ভেতর ?
নদীর শীতল স্রোতের গতিতে আমার গা ঘেঁষে ফিসফিস করে বলে-
দেখবে তুমি ?
লম্বা শীর্ণ আঙুলে প্যাঁচ ঘোরাতে ঘোরাতে দড়ি খুলে —
বের করতে থাকে এক একটা ছবি।
উৎসাহিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম তুমিও কি..
মেঘ সূর্যের মত ছবি আঁকো ?

সে বলল নিশ্চয়ই আঁকি, দেখো।
কী আশ্চর্য্য। এ যে পাতায় পাতায় আমার জীবনের
পেরিয়ে যাওয়া নানা দিনের ঝর্ণা ছবি।
ভীরু কণ্ঠের আনন্দ মাঠে তখন আমার এলোমেলো ছোটাছুটি।
তবে কি তুমি আমায় ভালোবেসেছো ?
এতো নিখুঁত ভাবনার রং ভালোবাসা ছাড়া আসে কি ?
কোথায় পেলে এসব ?
ঋতু চক্রের গালভরা হাসিতে বলে
সব পেয়েছি তোমার মনের রামধনু থেকে।
অনেক কৌতূহল তখন তাকে ঘিরে— তুমি কি চোর না জাদুকর ?
আমি যেন তার খোলা বইয়ের পাতা।
বলে - আমি জীবন প্রেমী,
আকাশে নয়, মাটির কাছে থাকি।

এবার বুড়ো তার বস্তা বন্দী করে কাঁধে তুলল।
আমি তখন অসহায়ের মতো তার ছায়া আঁকড়ে ধরি
আর একটু কি থাকা যায় না ?
আরো যে কিছু ছবি দেখা বাকী।
যেতে যেতে পিছন ফিরে তার ঠোঁটের হারানো গলি মোড়ে
হাসির সাক্ষর রেখে বলল- সে ছবি একদিন না হয়-
আকাশের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবো
নীল খামে ভ'রে।
তারপর সাইক্লোন পায়ে হারিয়ে গেল —
কোথাও ঘন অন্ধকারের জানালা ধরে।
আমি তখনও বসে স্তব্ধতার গভীরে...

তোমাকেই চাই

প্রসাদ মল্লিক

বিষন্ন বাতাসের ভূমিতে তুমি গোপন রেখেছিলে যে সব মায়াবী কান্নাগুলো-
তার সবটা জুড়ে এখন শুধুই নির্লিপ্ত পলাশ-প্রান্তর।
এ ফুলের কোনো গন্ধ নেই,
আছে শুধু তোমার নৈসর্গিক ঘ্রাণের তীব্র সজীবতা,
যা সীমাহীন আকাশের আদালতে
বিচ্ছেদের মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে গর্জে ওঠে বারবার।
তোমার ক্লান্ত নূপুরের আর্তনাদ জুড়ে
এঁকে দিতে চায় এক-একটা জীবন্ত চুমু।

তুমি আমার পাশে নেই-
এই অনন্ত সত্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমি একা,
আজও তোমাকেই চাইছি, ঘাতক-সম প্রতিটা বসন্তে।

এম্বিশন

সুদীপ্ত বিশাল

শূন্য থেকে শুরু হোক জীবন,
এগিয়ে চলি জীবনের পথে সংখ্যাতত্ত্বের হাত ধরে।
জীবনের মাপকাঠি তে শূন্যের সংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে,
হিসেবের খাতায় আমাদের জীবনে পড়ে যায় শূন্যতার ছায়া।
তবু আমরা এগিয়ে চলি নিজেদের জীবন পথের অর্থের তাগিদে
শূন্যের সংখ্যা বাড়াতে,
কোথায় যেন হারিয়ে গেছে আমাদের মানবিক চেতনাগুলো।
সাপ লুডো খেলায় মত্ত আমরা,
শুধুই খুঁজি সিড়ি, ভুলে যাই সাপ নামক ভাগ্যচক্রের কথা
যার মুখে আমরা পড়তে পারি যে কোন মুহূর্তে।
তাই জীবনের লক্ষ্য হোক, সততা।
এম্বিশন হোক মানব সেবার মাধ্যমে, নিজেকে মেলে ধরা।
এটাই হোক আমাদের প্রচেষ্টা।

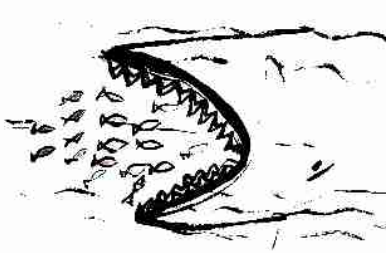

উপসংহারে

গৌতম নায়েক

.....তারপর ?
তারপর কেটে গেছে বেশ কয়েকটা রঙহীন বসন্ত।
শুনেছি কোকিলের বেদনাময় কণ্ঠ।
সম্পর্কের খরতাপে অথবা প্রকৃতির নিষ্ঠুর অভিশাপে,
একটা একটা করে তীব্র যন্ত্রণায়
ঝরে পড়েছে কৃষ্ণচূড়ার কচি পাতা।
তবুও নিঃশব্দে, নীরবে একা দাঁড়িয়ে কৃষ্ণচূড়া।
তার জীবন্মৃত দেহ পটে অতি সযতনে আঁকা
দুটি নামের প্রথম দুটি বর্ণ,
হাজারো ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে।
হয়তো সাক্ষ্য বহন করে চলবে আমৃত্যু,
ডুলুং এর স্রোতের মতোই...!

ধর্ম

পম্পা দাস

সেদিন আমরা দুজন এক নীল আকাশের নীচে
হাত ধরে হেঁটেছিলাম,
হৃদয়ে ছিল এক মায়াময় স্বপ্নীল জগৎ-
পরিবেশ ছিল এক বুক প্রসন্নতায় ভরা
মৃদু মিষ্টি হাসির মতো রোদ।
আমরা দুজন হারিয়ে যেতে চেয়েছিলাম
ওই সুদুরের পারে দিনান্তের ওপারে থাকা
কোনো এক অজানা বিস্ময়ে।
জানা ছিল না কী অপেক্ষা করে আছে ওপারে-
তবু এগিয়ে যেতে চেয়েছিলাম একে অপরের
অগাধ বিশ্বাসে ভর করে।
ভালোবাসার মেজরতায় দুজন ছিলাম পূর্ণ।
যত এগোচ্ছি— তত উজ্জ্বল হচ্ছে ভালোবাসার হৃদয়
দুজনে তখন ভালোবাসার নীড় গড়ার অঙ্গীকারে নিমগ্ন,
হঠাৎ– হঠাৎ সব অন্ধকার-
গাঢ় কালো অন্ধকারের বুক চিরে কাঁটাতারের বেড়া স্পষ্ট-
মানুষের মুখোশ পরা কিছু প্রাণি ঘিরে ধরলো আমাদের।
মসজিদ ও মন্দির নাকি এক হতে পারে না—
গীতা ও কোরাণ নাকি এক হতে পারে না—
ঈশ্বর ও আল্লা নাকি এক হতে পারে না—
বোরখা ও শাড়ী নাকি এক হতে পারে না—
তবে ? তবে ?
ফিরে যাওয়ার হুঙ্কার এল—
প্রেম বলে কোনো ধর্ম নেই-
ধর্ম তো হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান
ভালোবাসা কোনো পরিচয় হতে পারে না
পরিচয় তো হিন্দু-মুসুলমান খ্রিষ্টান
সেদিন দুজনের ভালোবাসা ভরা হাত দুটিকে
আলাদা করে দিয়েছিল তথাকথিত মানুষদল
উচ্চৈঃস্বরে প্রতিষ্ঠা করেছিল এই বলে—
'প্রেম অনুভূতি মিথ্যে,ধর্ম মহান।'
সেদিনও ছিল দুজনের মাথার উপর
এক আকাশ, এক সূর্য, এক আলো
শরীরে বইছিল এক ধর্মের রক্ত
হৃদয়ে ছিল মনুষ্যত্বের ভালোবাসা।।

অভিশপ্ত ঈশ্বরের অপেক্ষা
সায়ন মিত্র

গোধূলীর অন্তরালে অনেক গল্প লুকিয়ে থাকে,
রক্তবীজের মতো তারা, গোপনে বাড়তে থাকে
একটু একটু করে।
কেই বা খোঁজ রাখে ?
নিকষ রাতের বাসর ঘরে
কত প্রেম নীলামে ওঠে রোজ ?
প্রতি পদক্ষেপে একাঙ্ক নাটকের পটভূমি পরিবর্তন-
শ্মশানের নিরবতা মাখা হৃদয়ের প্রেক্ষাপটে আজ
অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছে কেউ . . .
তোমার অপেক্ষায়।

তুমি দেখেছে তাকে ?
তুমি কী দেখেছো ?
প্রতি মুহূর্তে তার পরাজয়।

তুমি কী জানো ?
জয় পরাজয়ের হিসেব কষতে কষতে
ঈশ্বরও আজ বড়ো ক্লান্ত,
বিশ্রাম চায়।
প্রতি রাতে বাঁধানো ফটোফ্রেম ছেড়ে,
ঈশ্বর নেমে আসে, হাঁটু গেড়ে বসে।
অনেক নিদ্রাহীন রাতে, আমি দেখেছি,
অভিশপ্ত ঈশ্বরের চোখের জল,
মেঝেতে জমে থাকা ধূলোয় জলের দাগ
রোজ মুক্তি চায়।
অবসন্ন ঈশ্বরও বিশ্রামের প্রার্থনা করে।
শুধু হৃদয়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে থাকা এক
অস্পষ্ট আমি, আজও ক্লান্তিহীন-
দাঁড়িয়ে থাকি ঠায় তোমার অপেক্ষায়।
অভিশপ্ত ঈশ্বরের চোখেও আজ অপেক্ষা-
তোমার স্পর্শে শাপমুক্তির অপেক্ষা।
তুমি কী দেখতে পাও ?

প্রিয় ঝাড়গ্রাম
সৌরভ মিশ্র

আমার প্রাণের বড়োই প্রিয়
সুন্দরী ঝাড়গ্রাম,
শাল পলাশের পাতায় পাতায়
লেখা যে তার নাম।

ঝাড়গ্রাম মানে ডুংরি পাহাড়,
ডুলুং কাঁসাই নদী,
ঝাড়গ্রাম মানে জঙ্গল যার
জীবনের প্রতিনিধি।

ঝাড়গ্রাম মানে ধামসা মাদল
ঝুমুর টুসু ও ভাদু,
গ্রাম ও শহর মিলে আছে যেন
মহুলে সাথে মধু।

ঝাড়গ্রাম মানে মিলেমিশে আছে
বহু জাতি উপজাতি,
ঝাড়গ্রাম মানে অভাবী জীবন
তবুও হাসিটা সাথী।

যুগ যুগ ধরে ঘটেছে এখানে
কত শত সংগ্রাম,
তবু শান্তির নীড় হয়ে আছে
আমাদের ঝাড়গ্রাম।

নাড়ির বাঁধনে জুড়েছি এখানে
তাই এত ভালোবাসি
এই সব নিয়ে সব ভালো থাক
যত ঝাড়গ্রামবাসী।

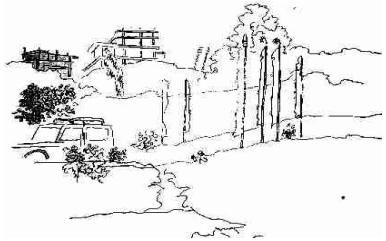

বন্দী
চৈতালী সাহু

আমি জানি ওপারে তুমি অপেক্ষায়, এপারে আমি,
তবু এক আলোকবর্ষ দূরত্ব।
যেন কল্পনারও অতীত।

হয়ত রোজ সময়ে, অসময়ে, কারণে অকারণে,
পরস্পরের লেখা, ছবির সামনে নীরবতা পালন করি।

হয়তো নিজের ভালবাসা, আশা, আর স্বপ্নের মৃত্যুশয্যায়,
শেষ পুষ্প স্তবকটি সাজিয়ে রেখেছি, পরম আদরে,

অথবা কালবোশেখী পেরিয়ে,
অশ্রু ভেজা স্বপ্নবীজের ঘুম ভাঙা দেখেছি,
রাত্রির গভীর প্রহরে, সংগোপনে,
তার শিকড়ে সিঞ্চন করিনি ভালোবাসা, অভিমানে।

তবু সে বেড়েছে ক্রমশ,
আপন খেয়ালে,
অভিমানের ভাঁজে আরো তীব্র ভাবে,
যাকে বিস্মৃতির অবহেলা পারে না ছুঁতে,
অথচ কালবৈশাখী পেরিয়ে,
অঙ্কুরিত স্বপ্ন, আশা, আজ মহীরূহ হৃদয়ে,
যার শিকড়ের জালে নিজেই বন্দী আমি
নিজের ভিতরে।।

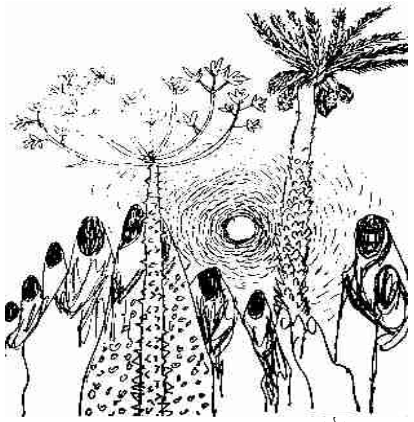

সম্পর্কের টানাপোড়েন
মধুমিতা দত্ত সিংহ

বয়ে যাচ্ছে সময়
ক্ষয়ে যাচ্ছে শরীর
ইচ্ছে শক্তির জোরে আজো
আছি বেঁচে নয় মৃত।

সম্পর্কের টানাপোড়েন
ক্ষতবিক্ষত পোড়া মন
দায়িত্ব বোধ কর্তব্য বোধ
আজ অভ্যাসে পরিণত।।

গভীর সম্পর্কের বুনোট
দূরত্ব আর সময়ের অভাবে
তানপুরা তোলে না সুর,
গেছে তার সকলি ছিঁড়ে।।

বেঁকে গেছে দুজনার পথ
আজো রয়ে গেছে অজানা
হারিয়েছে ঘুড়ির লাটাই
গোপন তারাদের ভিড়ে।।

খোলা ব্যালকনির অবকাশ
মন মাতানো বসন্তের হাওয়া
দেয় না দোলা মনের ঘরে,
হারিয়েছে সে কতকাল।।

রঙিন ফুলের জলসা
পাখিদের খুঁটে খাওয়া ধান
পড়ে না চোখে আর দেখিনা
শিশির ভেজা সকাল।।

ফিরে গেছে বাউলের দল
ঝরে পড়ে রাতের শিউলি
নিঃসঙ্গ উঠোন ও আজ
চাতকের মতো বারি চায়।

আয়নার ঢাকা চাদর
বহুকাল ওঠেনি তার আবরন
মৃত মন কি দেখিবে হায় ?
আয়না তুমিও অসহায়।।

লেপচা জগতে, একদিন

অঞ্জন সিকদার

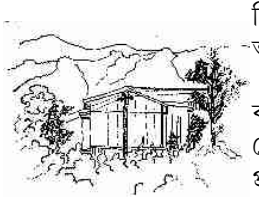

কখনও মেঘ, কখনও আঁধার
লেপচা জগতে সূর্য খুঁজে পায় না
প্রকাশের পথ। এখানে কে দিয়েছে ছেড়ে মায়াবি বক
দূরে ছবি কাঞ্চনজঙ্ঘা, মিরিক আছে পথের শেষে
মাথা জুড়ে ঘুম, ও পাশে কালিম্পং, এপাড়ে সুখিয়া পোখরি
এখানেই তো কেউ দাঁড়িয়ে বলেছিল
ভালবাসি ভালবাসি
দিগন্তের লক্ষ্যে এই বাঁকেই দ্যাখো
আমি হারিয়ে ফেলেছি আমার দিগ্বীজয়ের রথ

কখনও মেঘ, কখনও আঁধার
লেপচা জগতে সূর্য খুঁজে পায় না
প্রকাশের পথ। এখানে কোথায় স্বজন, বান্ধব গেছে সংসারে
বাঙ্গিঝোরার উৎস সন্ধানে
কে ভৈরবীতে সাজাল জীবনের সুর
কখনও মৃদু; অশ্রুতপূর্ব, কখনও গম্ভীর
এই নিমীলিত, পরক্ষণেই ছন্দোময় উচ্ছ্বাস
তুমি ছুঁতে পারবে না তাকে, তবু
সে ভরে আছে তোমার অভ্যেসে

কখনও মেঘ, কখনও আকাশ
আলো আঁধারির লেপচা জগতে
এভাবেই ভেসে থাকে জীবনের স্বপ্ন।

নীল ধ্রুবতারা

আরতী পাল

শত সহস্র জোয়ারে আছড়ে পড়ুক
গণতন্ত্রের গণসঙ্গীত
শত সহস্র যুবকের রক্তবীজ গর্জে উঠুক
মাতৃজঠরে
কুসংস্কারের জাল ছিঁড়তে ছিঁড়তে উন্মোচিত হোক
প্রকৃত মানবসত্ত্বা
প্রকৃতির রঙ বদলের পালায় সামিল হোক
জীবনের ব্রত
দেখো
বহু আলোকবর্ষ দূরে এখনো জেগে আছে
আমাদের আশালতা, নীল ধ্রুবতারা।

ঐকিক রেখা

দুঃখানন্দ মণ্ডল

ভুলে যাবো বলে
অভিমান করিনি।
ভুলে যাবো বলে
কোনো অভিযোগ ছিল না।

তুমি বেশ আছো পর্দার ওপারে
প্রতিনিয়ত উঁকি দাও
প্রশস্ত রাস্তা পেরিয়ে আমার দরজায়।

তুমি বেশ জানো;
আমার হেরে যাওয়ার কারণ
দাবার গুটি চালো অজানতে নিজের জন্য।

ভুলে গেছো কি কারণ ছিল অভিমানের !
ভুলে গেছো কি কারণ ছিল একটি কলের !

ভুলে যাবো বলে অভিমান করিনি
ভুলে হাবো বলে তোমার হাত ধরিনি
কেমন করে সময় চলে যায় হারিয়ে যাওয়ার !
সময়ের মানদণ্ড ঐকিক নিয়মে আর মিলে না
সম্পর্ক ভাঙতে থাকলে মুছতে থাকে স্মৃতি
নদীর কিনারা হারিয়ে ফেলে পাড়
স্রোত নয়নজুলি ছুঁয়েছে
দূরত্ব ক্রমান্বয়ে অনুভব করে এক গভীর শূন্যতা....

প্রেমের বৃষ্টি

সৌমিত্র মুখার্জী

প্রকৃতির অন্তরঙ্গ দৃশ্যে-
এক উদভ্রান্ত আলোকময় দিন।
মুখ লুকায় ঝর্ণা ঝোরা-
মাটির গন্ধে ভরে যায় শরীর।

আলোর আড়ালে তারের বাজনা-
গিলে ফেলে অন্ধকার চর।
বিস্তৃত মন্বন্তরের জমি-
মজ্জায় মজ্জায় ভালোবাসার লালারস।

জীবনের ঘাত প্রতিঘাত স্বচ্ছদর্পণে-
মননে-গভীরে-অবচেতনে।
ঝড় উঠেছে মনে দেওয়ালে-
পট পরিবর্তনের স্বাক্ষী হয়ে।
তারপর একদিন...
কবিতার বাসরে নামে প্রেমের বৃষ্টি।

হিংসা

রোহিনী নন্দন কদমা

চায় না ভালো অন্যের সুখ
হিংসায় সদা জ্বলে বুক।
কর্ম না করে ফোলের আশে
এতটায় মোরা সর্বনেশে,
জীবন তাইতো পাপের ভারে
নিমজ্জিত অন্ধকারে,
আলোর দিশা পাই না খুঁজে
এতটাই এ অসুখ-
কর্ম না করে ফলের আশে
হিংসায় জ্বলে এ বুক

তফাৎ

তপন চক্রবর্তী

আমার বাড়ির
বিছানা ভিজছে
ওদের ভিজছে ছাদ,
ওদেরই যত
আলো অধিকার !
আমার নেমেছে রাত।

ওদের বাড়ির
ঘুমায় সবাই,
আমার বাড়িতে কান্না,
পায়েস খাচ্ছে
ওদের কুকুর
আমার হয়নি রান্না

ওদের বাড়ির
পায়রা উড়ছে,
আমার উড়ছে খড়,
টিভিও চলছে
ওদের বাড়ির
আমার নড়ছে ঘর।

ইচ্ছে

ইচ্ছে আছে কোনো একদিন
পৃথিবীর যত দেশের জাতীয়
পতাকা আছে, সেগুলো
একসাথে সেলাই করে,
পাঁচ মাথার মোড়ে টাঙিয়ে
দেবো, আর উলঙ্গ হয়ে, শুয়ে
থাকবো তার নীচে।

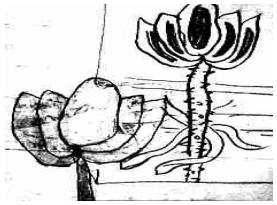

বাইচ্ ব যদিন লাইচ্ ব তদিন

জিতেন্দ্র নাথ মাহাত

বলি- হেঁ-ব-অ খুড়া-
বড় পূজা ত-অ লইজ্ কাঁই আইল-অ,
কাঁঠিলাচের আখড়াটা খুইল্যে হথ্যেক্ নাঞ ?
ঘরে গবচ্যে গবচ্যে এ বছরটাত-অ কাঠুয়াঞ গ্যেলি।
পরববটাই একটু লাচন কুদন করা হথ্যেক।
হঁরে বাপ ! আমিত-অ সব সময় আছি,
ত-মাদলটা বাজাবেক কে ?
খুঁদটাও ত-অ এবছর ঢের লড়বড়াই গ্যেছে।

কেনে-ব-অ খুড়া,
কচাপাড়ার গুরাই আছে।
হঁরে-বাপ ঠিকেই বল্যেছিস্,
দে তবে আইজ্কেই সক্যেলকে খবরটা দিঁয়ে দে,
কাইল্-কেই আখড়া খুইল্যে দিব।
আর- হেঁ বাপ, লাচইয়া গিলা সব আছে-ত-অ ?
হঁ-ব-অ খুড়া, ঐ -ত-অ গণশা, মোণ্টা, মোধা,
এরা ত-অ সবেই আছে।

তবে ঠিকেই আছে বাপ,
আইজ্ কাইল্-এর ছা-রা কেউ
এসব লাচ কইর্-বেক লাই।
খালি মোবাইল টাই ছবি তুলে
লইটে লইটে দেখতে থাইক্-বেক।
এই সব লাচ গিলা আর দেশে থাইক্-বেক লাই।
আইজ্ কাইল্-এর ছা-ছোকরা-রা
কেউ কইরতেও চায় লাই
আর কেউ শিখতেও চায় লাই।

বলি হেঁ বাপ, কাঁঠিলাচের আদিটা জান-অ ?
যখন মা দূগ্গা মঁইষাসুরকে তিরশূলটা ঢুকাইঞ দিল-অ
মঁইষাসুর চিৎপটাং হঁয়ে গেল-অ
তখনি-ত-অ আনন্দে সগ্গে দেবদেবীরা, আর-
মত্ তে নরনারীরা লাইচ্যে উইঠ্ল-অ।
তাই সব বছরেই দূগ্গা পূজার সময়
কাঁঠিলাচ টা করা হয়।

...পরের পাতায়

কত আনন্দ ফুর্তি করে-
মানুষের সঙ্গে ম্যালে ম্যাশে
দিন গিলা কাইট্'থক।
আর এখন কি দিন আইল-রে বাবা
কেউ কার-অ সঙে কথায় বলে লাই।

হঁ-ব-অ খুড়া, দেইখ্ছ লাই
যা দিনকাল চইল্ ছে।
তাই বলছি-
বাঁইচ্ ব যদিন
লাইচ্ ব তদিন
গাইব-অ পরাণ খুলে,
ধা-তিন ধা-তিন
ধামসা মাদল
বাইজ্ বে তালে তালে।

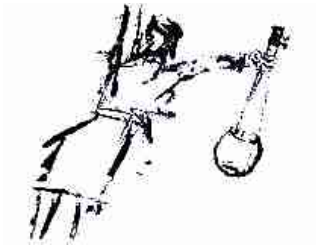

সোনার চাঁদ

অসীম মাহাত

হার রে সোনার চাঁদ, মানিখ হামার।
জারহা তখেএ পিথিবির আলঅ দ্যাখাইলঅ,
বড়অ কইরলঅ
অরহাকেই ভুইলেএ সেন,
পাওডার লেইসেএ বহুকে নিয়েঁ
আড়াফাটা দ্যাখায়ঁ ইঁড়কে বুলছিস।
দামি দামি ফেলাট, গদি গিলাআ
নগরা কইরেএ দিবেখ বইলেএ
টুকু ঠাঁয় দিলিস নায়ঁ।
বুড়হা মায়ঁ বাপ গুহেএ মুতেএ
হঁজলঅ খাইটেএ পাখ পাখ কইরছেএ,
মু টাই টুকুন জল দিবার লখ নায়ঁ
আর তরহা লখ দ্যাখানি
মায়ঁ-বাপ দিন পালছু,
হায় রে হায় কপাল !
হামকে ত তদের কিত্তি দেইখে
হামিই লাজায়ঁ হছি।
ধুর চাঁদি, হামার আরহঅ
কিসের লাজ, কিসের শরম !

পুরুষ ও পৌরুষ

প্রসেনজিৎ বেরা

জিজ্ঞাস্য আছে তোমাদের কাছে, চরম অসন্তোষে !
বিবেক, বুদ্ধি, লজ্জা, শরম, হারাইলে আপন লালসে !
শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ আর পৌরুষের অহংকার এই-টুকুনই সার।
জগৎ দেখাল যে জন তোমায়, লইয়া প্রাণের ঝুঁকি,
সেই তাদেরই সম্ভ্রম হর, ধন্য এ জনম বুঝি।
জননী, ভগিনী, কন্যা তোমার সকল নারীর জাত,
এই সত্য স্বীকৃতে মোদের, হয় কোথায় সংঘাত ?
ঘৃণ্য তুমি, নগ্ন আজিকে, বদ্ধ হয়েছো আপন বাসনা মাঝে।
পুরুষের সমুখে পৌরুষ দাঁড়ায়ে, সম্মানের আসন খোঁজে !

বিষাদময়তা
অনামিকা দত্ত

সময়টা বড়ই আজবপূর্ণ
বিষাদময়তায় ঘেরা,
যেদিকে তাকাই মেকি সবই
শূন্যতা আগাগোড়া।

পৃথিবী নামক গোলকধাঁধায়
আমরা ক্ষণিক অভিযাত্রি,
বয়ে চলেছে জীবন প্রবাহ
চিত্তের সন্ধানে দিনরাত্রি।

কেবা খুঁজে কার পূর্ণতা
নিছক আপনতার অবগাহনে,
বিশালতায় হাতড়ে বাঁচি
নিজস্ব চেতনার অনুসন্ধানে।

বিষাদময় কালো সময়গুলো
শুধুই পথ করে অবরোধ,
রুখে দাঁড়াই তবুও নিজে বেগে
করি নির্মল প্রতিরোধ

ছত্রখান
সৌমেন্দ্র দত্ত ভৌমিক

যত না বিখণ্ড চুপচাপ শুয়ে কাটে
শব্দময় দীর্ঘ রাত
তদধিক বীভৎস ভয়াল ত্রিশূলের ভূত-নাচন
তুলে নিয়ে চলে অন্ধ গুহায়,
এবার নবমীর পাঁঠার বুকে গুরুগুরু ডাক
কান পেতে আগ্রহে শুনি কিম্ভূতকিমাকার।
তখুনি চোদ্দ পুরুষের দোষ দাঁড় করাই
অবশেষে শিখণ্ডির মতন,
আড়ালে-আবডালে লক্ষ কোটি
গলদ আবৃত হয় কারিগরী-দক্ষতায়,
বলির স্বপ্নে বলীর অহেতুক ভাবনাগুলো
ভাসমান, ভাসতে ভাসতে ভাসতে
আকাশ ছায় বহাল তবিয়তে।

তেলের প্রদীপ
তপন সনগিরি

একটা সময়
চোখে তেল লাগাতাম-
ঘুম তাড়ানোর জন্য
বইয়ের এলোমেলো বর্ণগুলো
অন্ধকারে দানবের ন্যায় তেড়ে আসত,
আমার তেলের প্রদীপ জ্বলত সারাক্ষণ।
এভাবেই কেটে যায়
কয়েকটা গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ
তারপর হঠাৎ-ই একদিন
মেঘের সম্ভোগ দেখলাম
দেখলাম আকাশের গর্ভে বৃষ্টি ধারণ
ও জলের জন্ম।

তখন চোখে তেল লাগাতে হয়না
ঘুম যেন পদ্মপাতায় জল।
এখন চোখ জ্বলে
একটা আঁশটে গন্ধ সমগ্র বিছানা জুড়ে।
আমিষাশী বুভুক্ষু আঙুলগুলো
নখ বিস্তার করে-
ছিঁড়ে নিতে চায় কাঁচা মাংস।
জান্তব এই দেহখানি
সর্বস্ব নিংড়ে হতে চায় একেবারে নিঃস্ব।
অবশেষে
গোলাপ জলে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে
শীত আসে ভোরে।

এভাবেই পেরিয়ে যাবে জানি
কয়েকটা অমাবস্যা; কয়েকটা পূর্ণিমা।
ধীরে ধীরে বৃদ্ধ হবে তন-মন
ঘুম আসবে শ্যাওলা পড়া চোখে।
দেবো দূর দেশে পাড়ী
রেখে যাবো তেলের প্রদীপ
বংশপ্রদীপের তরে ছাড়ি।।

পুত্রশোক
শচীন প্রামানিক

নড়বড়ে হাতে লাঠিটা কাঁপাতে কাঁপাতে
বেরিয়ে আসে সাগেন মাঝি ঘর থেকে
আজ মনে হয় ছেলেটা ফিরবে তার
শাল পাতের চুরুটায় টান দিয়ে
ধোঁয়ার খেলা দেখে সে
তিনদিন আগে ফুলকির মায়ের ফোনে
ফোন করে বলেছিল—
''বাপ হে আমি ঘর যাছি''
আজো তো পৌঁছালো না,
চেন্নাই কি অনেক দূর !
এক বছর পর ছেলে তার বাড়ি ফিরবে
সাগেনের মন অবিচল
দলদলে মাটির মতো হৃদপিণ্ডটা উঠছে বসছে
দস্তর খানার হিসাব কষছে মন
পিতৃস্নেহের চাবুক পড়ছে অবিরাম
ঋণধারের সমাপন ঘটবে
এক বসন্তের আগমনে।

অকালের কাল এসে
নিয়ে গেছে সাগেনের বেটাকে
বাস দুর্ঘটনার পর
লাশ কাটা ঘরে প্রহর গুনছে
কিছুক্ষণ পর সাদা কাঁচের গাড়ি উঠোনে
আজ তার ছেলে এসেছে নিথর হয়ে
শূন্য কলিজার কান্না বেগ মানে না
বাঁকা পাঁজরের চামড়াগুলো
যেন গলে পড়ে যেতে থাকে।
বিড়বিড় করে বলতে থাকে-
''ঋণের উপর ঋণ তাঁর
ঋণী করে রাখলি রে বাপ,
শেষ দেখার সংলাপটাও করলি না।''

মাটিতে লাঠিটা হালকা গেড়ে
নতজানু সাগেন
সন্তানের আবছা ছায়া দেখে
উঠোনের কালো পাথরটায়।

ঝড়
মন্দিরা মিত্র

সে এক অচিন মুখের নিবিড় দরদ
মানছে না আর বাধা।
মেয়ের বিরাট অভিমান,
দাপট দেয় যে সাড়া !
ঝড়ের বেগে খেলে খেলায়
কান্না হাসির ধাঁধাঁ।
সকল মুখ পানে চেয়ে
হাসতে বিকেল যায় পেরিয়ে
কঠিন বদন, কোমল হৃদয়
অভিমানী মেয়ে।

নামহীন
আতাউল গাওস

জলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি
অথচ একবিন্দুও পিপাসা নেই
ফেলে আসা স্বপ্নগুলো কুয়াশার মতো
লেগে যায় চশমার কাঁচে
চারপাশটা ঝাপসা হওয়ার আগে
এসো, চোখের পাতায় চুমু আঁকো

বাতাস গোপন করেছে
যে কথা তুমি সবুজ পাতাকে
বলেছো মনে মনে
প্রবল ঝড়ে উড়িয়েছি পোষাক...আর
বিদ্যুৎ ঝলসানো নগ্নতায়...
অবিরাম বারিধারা—
এখন কেউ কোথাও নেই,
শুধু অন্ধকারে হাজার হাজার ভয়ার্ত চোখ
আমি এইপারে, তুমি ওপারে
দিগন্তে দুলছে বাঁশের সাঁকো...

ভাবনা
কমলেশ নন্দ

কীসব অবুঝ আলোচনা !
শিস দিতে দিতে এগিয়ে গেল বয়স

জানালার পর্দা সরানো হয়নি বহুকাল
দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডার
সেও পেছনে ফেলে আসা বিশ বছরের,
উঠোনের কোণে কোণে অযত্ন হাওয়া

তুমি তো অন্য কথা ভাবো !
আমিও যুধিষ্ঠির নই—

এখনও অনেক পথ
অনেক সবুজ-মাঠ অজানা অচেনা।

প্রতিবিম্ব
তমাল চক্রবর্ত্তী

জীবনের সাথে বৃষ্টির
একটা মিল আছে
ঝরে পড়ে বয়ে চলে
থেমে থাকেনা ফিরে যায় না।

শৈশবে ফিরতে চাওয়া
বৃষ্টির মেঘের কাছে ফিরে যাওয়া
স্বপ্নের ইচ্ছে ডানা আছড়ে পড়ে
সময়ের স্পর্শমাখা ভিজে মাটিতে।

তবু বৃষ্টি থেমে গেলে
সেঁদো মাটির গন্ধ ডাকে চুপিসারে
ছুটে যাই, খুঁজে দেখি
ফেলে আসা আমির ফ্যাকাশে প্রতিবিম্ব।

শুনো তবে দুটো কথা
শেখর মাহাত

আজই বলইবঅ হামি বন পাহাড়ের দুটা কথা শুন।
এখনো তাদের খাইএতে হয় মাড় ভাত আর নুন।
সিখাএ আছেক সাঁওতাল মুন্ডা কুড়মি জাতি।
কারেনের বাতি নাই জ্বলে কেরাসিনের বাতিক।
লেখা পড়হা শিখবেক কুথাই
গোরামে স্কুলেঅ-ও ত নাই।
মঙ্গল বারে বীর মাদলে বসে হাট আর বিকে বনের শালপাত।
স্বাধীনতার এত বছর পরেও কতক মানুষ অনাহারে মরেক।
আর কিছু বলথে গেলে হামদের এই পুলিশে ধরে
ভোটের আগুই বাবুরা আসে বলেক অনেক কিছু দিবেক
ভোট ফুরালে সেগুড়ে বালি
আর দিবেক কবে ?
স্বাধীনতার এতক বছর পরঅ
কতক রুখা শুকাই ভকা পেটে মরে।

সমাজ যুদ্ধ
সুমন চ্যাটার্জী

এবার যুদ্ধ শেষ হবে না-খতম হবে।
আবার যুদ্ধ উঠবে বেড়ে সগৌরবে
এবার যুদ্ধ ওর ভাসভাসি
আমার হবে।
শান্তির জন্য যুদ্ধ হবে শান্তি রবে
শান্তির যুদ্ধ সত্য দিয়েই লড়াই হবে
আবার যুদ্ধ সত্যি বলতে সবার হবে,
আবার যুদ্ধ মিথ্যে হবে না
সত্যির হবে।

তোমার আমার শান্তি নিয়েই যুদ্ধ হবে
গ্রাম শহরের নর্দমাতে কালচে রক্ত বইয়ে দিয়ে
যুদ্ধ হবেই।
ছেঁড়া পাতায় কবিতা দিয়েও যুদ্ধ হবে
বন্দুকের নলে গোলাপ গুঁজেও যুদ্ধ হবে
শাসক তুমি বন্দুকদের শানিয়ে তুলে দাও আওয়াজ
সবার আছে গলার আওয়াজ দেখবে আজ
যুদ্ধ হবে গলায় গলায়
যুদ্ধ থাকবে মিথ্যে বলাই
সবার যুদ্ধ সবাই মিলে শানিয়ে তোলো
সত্যিটাকে সবাই মিলে সত্যি বলো

বিদ্রোহী প্রাণ সবার জন্যে বাঁচবে আরো
তোমরা যদি নিজের মাঝে যুদ্ধ ধরো।।

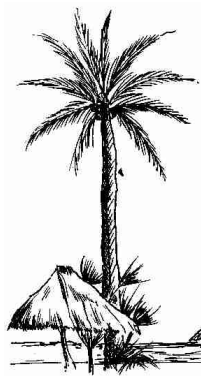

গাছের কথা
লক্ষীন্দর শীট

গাছেরও প্রাণ আছে,
মানুষেরও জীবন আছে,
তাই মোরা গাছকে করবো না অবহেলা,
যখন তখন গাছেদের কাটবো না ডালপালা,
তাদেরও কষ্ট হয় কে বা তা বোঝে !
গাছের কত জিনিস লাগে আমাদের কাজে।
তাই বলি গাছকে
বেকার কেটো না,
সব গাছ যদি কেটে দাও,
তাহলে জীবন পাবো না।

গল্প
ও
কথা

ধূপওয়ালা

সুস্মিতা রায়চৌধুরী

স্নেহা হঠাৎ শুনল ফ্ল্যাটের নিচে প্রতি মাসে ধূপ বিক্রি করতে আসা ফেরিওয়ালা ভদ্রলোক খুব জোরে বৌদি বৌদি করে ডাকছে। ওনার ওই জোরে জোরে ডাকার জন্য অন্যান্য ফ্ল্যাট থেকে তীর্যক মন্তব্য ধেয়ে আসছে ওনার দিকে।

একটি ফ্ল্যাট থেকে একজন ভদ্রমহিলা বললেন, ''এই ধূপওয়ালা ! এখানে দাঁড়িয়ে এত চিৎকার করো না ! আমার ছেলে পড়াশোনা করছে ! আর তোমার এই সস্তার ধূপ এখানে কে কিনবে শুনি ?''

আর একটি ফ্ল্যাট থেকে আর একজন বললেন, ''এই লকডাউন আর করোনার পর থেকে এখানে ফেরিওয়ালাদের যাতায়াত বেড়ে গিয়েছে। কেউ কিনুক আর না কিনুক ওদের আসা চাই !''

ঠিকই বলেছেন ওনারা, কিছুদিন আগেও খুব একটা ফেরিওয়ালা আসত না এই দিকে। কিন্তু এখন করোনাতে কাজ হারিয়ে অনেকেই ফেরিওয়ালা। কেউ ধূপ তো, কেউ বাসন মাজার সাবান, কেউ ম্যাক্সি, বিছানার চাদর, আরও কত কি। সত্যি ! এই করোনার একটা বড় প্রভাব পড়েছে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর। যদিও এই সব বড়ো,বড়ো ফ্ল্যাটে বসবাসকারী মানুষজনেরা জানেন সবটাই। কিন্তু রাস্তার এই সব ফেরিওয়ালাদের থেকে বিশেষ কিছু কেনেন না, তবু ওনারা আসেন, মনের মধ্যে সুপ্ত একটা আশা নিয়ে— যদি কোনোদিন, একটা দুটো জিনিসও কখনও সখনও কেউ নেয়।

এমন ভাবেই একদিন বাজার করে ফেরার পথে ফ্ল্যাটের সামনে এই ধূপওয়ালা ভদ্রলোকের সাথে দেখা হয়েছিল স্নেহার। বলেছিল, ''বৌদি ক'টা ধূপ নেবেন ? জানেন তো আগে একটা জুটমিলে কাজ করতাম, লকডাউনের পর কাজটা আর নেই। জুটমিলটা বন্ধ হয়ে গেছে। পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা চাঁদা তুলে কিছু টাকা দিয়েছে। তাই দিয়ে এই ধূপের ব্যবসাটা করছি। বাড়িতে বৃদ্ধা মা, এক ছেলে, এক মেয়ে, বউ নিয়ে সংসার। কি করে চালাই বলুন তো ! তাও ক্লাবের ছেলেরা সাহায্য করল বলে চলছে কোনোমতে।''

স্নেহা সেই থেকেই ধূপ নেয় ওনার থেকে প্রতি মাসে। গন্ধ একটু কম, শেষ হবার আগে হয়তো নিভেও যায় একটা দুটো কাঠি, তাও নেয়। প্রতি মাসেই এসে নীচ থেকে ডাকেন, কিন্তু আজ যেন একটু বেশী জোরে জোরে ডাকছেন। স্নেহা মাস্কটা পরে নিচে নামতেই ভদ্রলোক বললেন, ''জানি বৌদি আগের সপ্তাহে দিয়ে গেছি কিন্তু আজ যদি একটু ধূপ নিতেন, ছেলেটার কদিন ধরে খুব পেটের যন্ত্রণা হচ্ছে, আজ ডাক্তার না দেখালেই নয়।''

''আপনি এই হাজার টাকা রাখুন, প্রতি মাসে ধূপ দিয়ে শোধ করে দেবেন। শুধু ডাক্তার ওষুধ করলেই তো হবে না, একটু পথ্যও তো দরকার। আর আমি বলে যাচ্ছি নীচের দারোয়ান ভদ্রলোককে, আপনি প্রতি মাসে ওনার কাছে ধূপ দিয়ে যাবেন। আমি পেয়ে যাব।''— স্নেহা বলল।

স্নেহা বুঝলো আজকের জোরে জোরে ডাকাটা কোনো ফেরিওয়ালার চিৎকার ছিলো

না, ছিলো এক অসুস্থ সন্তানের পিতার করুণ আর্তি। ওপরে ওঠার সময় স্নেহা শুনল নীচের ফ্ল্যাটের এক ভদ্রমহিলা বলছেন, ''জামা, কাপড়, সাজ সরঞ্জামে তো কোনো কার্পণ্য নেই, শুধু ঠাকুরের ধূপের বেলাতেই যত রাস্তার সস্তা ধূপ।''

অন্য ফ্ল্যাট থেকে আর এক ভদ্রমহিলা বললেন, ''আরে ছাড়ো তো এসব, আজকালকার দিনের আধুনিক মেয়েরা ঠাকুর দেবতা, পূজা অর্চনা এসবের কিছু বোঝে নাকি ? মনে ভক্তি শ্রদ্ধা একটুও নেই।''

একবার মনে হলো স্নেহার, গিয়ে বলে আসি— কাকিমা কতবছর আগেই তো স্বামীজি বলে গিয়েছেন। 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'। মানব সেবার মাধ্যমেই তো ঈশ্বরের সেবা করা যায়। কিন্তু এদের কথার উত্তর আজ আর দিতে ইচ্ছা করল না, স্নেহার। স্নেহা না শোনার ভান করে এগিয়ে গেলো।

সে ভাবলো একটা অসুস্থ ছেলে যদি ওষুধ পায়, আর তার পরিবর্তে তার ঠাকুর ঘরে যদি, একটু কম গন্ধের, সস্তা ধূপকাঠি জ্বলে, তাতে নিশ্চয় ভগবান রুষ্ট হবেন না ? লোকে কি বলল তাতে কি বা যায় আসে। স্নেহা যদিও জানে তার সাধ্য খুবই কম তবুও এমন একটা পরিস্থিতিতে যদি আমরা যে যার মত করে হাতটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারি অন্যের দিকে, তাতে ক্ষতি কি ! বিন্দু বিন্দু দিয়েই তো সিন্ধু তৈরী হয়।

❁ — ❁ — ❁

কালী

দেবাঙ্গন ঘণ্টেশ্বরী

সানইয়ের সুর টা কালীর বড়ো বেসুরো লাগছে। আজকে তার বিয়ে। বত্রিশ বছরে এসে দাঁড়িয়েও যখন তার গায়ের রং কোনো সুপাত্রের মন ভোলাতে পারেনি, তখন বাধ্য হয়েই তার বাবা মা এক ডিভোর্সী সহৃদয় পাত্র খুঁজে আনে তার জন্য। সে পাত্রের মন এতই বড়ো যে, আড়াই লাখ টাকা নগদ আর পনেরো ভরি সোনা-ই লেগেছে তার মন ভরাতে। আজ জীবনের এক চরম লগ্নে এসে কালীর মনে পড়েছে তার জীবনের কথা। তিনবোন আর এক ভাই তারা। আর মায়ের কোল আলো করে, কিংবা বাড়ির লোকের কথায় অন্ধকার করে প্রথমে সে-ই আসে। জন্মের পর থেকে তার গায়ের রং নিয়ে বারবার হাসির খোরাক হয়েছে সে। কখনো পোড়া হাঁড়ির রঙের সঙ্গে মেশানো হয়েছে তার গায়ের রং, আবার কখনো তাকে শুনতে হয়েছে, ''রাতের বেলা তোকে লাইট জেলেও খুঁজে পাওয়া যাবেনা''। তার গায়ের রঙের জন্যই তার এই নাম। তাকে দেখতে এসে সুপাত্ররা তার বোনদের পছন্দ করেছে। এখন তাদের পাঁচ ছয় বছরের ছেলে। অনেক অনেক কথা ভীড় করছে আজ তাকে। তার মনে পড়ছে কালী পূজোর আগে তার বাবা তার দুই বোনকে লাল টুকটুকে দুটো জামা কিনে দিয়েছিল কিন্তু তার গায়ের রঙে মানাবেনা বলে তার দেহে জোটেনি লালের ছোঁয়া। এতদিন সেই কালোর কারণে তার কপালে সিঁদুরের লালও জোটেনি। আজ তার ইচ্ছা করছে সব ভেঙে ফেলে সমাজ কে বলুক ''আমি কালী আমি রুদ্রানী''। যে তোমরা এক কালোকে দেবী রূপে পুজো করো সেই তোমরাই আর এক কালোকে ছুঁড়ে ফেলো কোন

সাহসে। বাইরে হঠাৎ উলুধ্বনি উঠলো। ওই বুঝি বর এলো। তার দুই বান্ধবী এসে বললো, শেষমেশ তোরও বিয়ে হচ্ছে তাহলে ! আর একটু পরেই টাকার কাছে বিলোবে তার গায়ের রং। তার মুখ ঢেকে গেল জোড়া পানে। আর ঢাকলো সমাজকে এক প্রশ্ন যা হয়তো কোনোদিন করা হবে না, যে সমাজে মাটির কালী পূজিত হয়, সেই সমাজে জীবন্ত কালীর দহন হয় কেন ?

❁ — ❁ — ❁

ধন্যবাদ

চণ্ডীচরণ দাস

একটি প্রতিষ্ঠিত শিশুদের পত্রিকার তরফ থেকে যখন তাকে বছরের সেরা গল্পকার হিসেবে মনোনীত করার খবর জানাল, চরণের তো প্রথমটা বিশ্বাসই হয় না। পরে আমন্ত্রণপত্র হাতে পেয়ে সন্দেহ দূর হল। নির্ধারিত দিনে দুরুদুরু বুকে বিড়লা সভাঘরে গিয়ে উপস্থিত হল তাদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে।

গিয়ে দেখল, হল কানায় কানায় পরিপূর্ণ, মঞ্চে উপস্থিত পত্রিকার কর্মকর্তাগণ আর বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে সাহিত্যের অনেক দিকপাল ব্যক্তিত্ব। তাদের কেউ চেনা, কেউ বা অচেনা। প্রদীপ জ্বালিয়ে সমবেত সঙ্গীত সহযোগে শুরু হল অনুষ্ঠান, বরণ করে নেওয়া হল বিশিষ্ট অতিথিদের।

এরপর শুরু হল মূল অনুষ্ঠান। সম্পাদকের বক্তব্যের পর ছড়া, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি নানা বিভাগে নির্বাচিত বছরের সেরা সাহিত্যিকদের নাম এক এক করে ঘোষণা শুরু হল। ঘোষিকা প্রত্যেকের সাহিত্যকীর্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তাদেরকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করতে লাগল। তারা মঞ্চে উঠলে ফুলমালা, উত্তরীয়, মানপত্র ও সাম্মানিক দিয়ে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হল। সবাই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যও রাখলেন।

বছরের সেরা গল্পকার হিসেবে তার নাম ঘোষণা হওয়ার পর ঘোষিকার মুখে তার সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ও সাহিত্যকীর্তির বর্ণনা শুনে চরণ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। দুরুদুরু বুকে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে পুরস্কার নিয়ে, নিজের অনুভূতির ব্যাপারে দু'চার কথা বলল। তারপর মঞ্চে বসা বিশিষ্ট অতিথিদের নমস্কার আর প্রণাম করতে যেতেই একজন চরণের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, ''আপনার মুখটা চেনাচেনা লাগছে। আপনার সঙ্গে আগে কোথাও কি দেখা হয়েছিল আমার ?''

চরণ হেসে বলল, ''আমিও আপনাকে কোথাও যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।''

''হয়ত কোনও অনুষ্ঠানে দেখে থাকবেন।''

''না স্যার, অনুষ্ঠানে নয়, আমি সাহিত্য অনুষ্ঠানে সচরাচর যাই না।''

''আচ্ছা, আপনি থাকেন কোথায় ?''

''গড়িয়ার দিকে, বোড়ালে।''

''ওখানে সাহিত্যিক অতুলকৃষ্ণ পালকে চেনেন ?''

''ভাল মতই চিনি স্যার। উনি আমার অগ্রজপ্রতীম, আমায় খুব স্নেহ করেন।''

''অতুলবাবু আমাদের আত্মীয়, আমি ওনার বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাই। হয়ত ওখানে আপনাকে কখনো দেখে থাকব।''

অতুল পালের নাম শুনে চরণের মনে পড়ে গেল বছর দুই আগের একটা ঘটনার কথা এর আগে চরণ কোনোদিন তেমনভাবে লেখালেখি করেনি। অতুলদার চাপাচাপিতে তার সম্পাদিত একটি ক্ষুদ্র পত্রিকার জন্যে প্রথম একটি গল্প লিখে সেদিন দিতে গিয়েছিল তার বাড়ীতে। তখন ওই ভদ্রলোক সেখানে বসেছিলেন। কৌতূহলবশতঃ লেখাটা হাতে নিয়ে এক ঝলক দেখে বলে উঠেছিলেন, ''এই বয়সে বেকার কেন সময় নষ্ট করছেন ? খান দান সুখে থাকুন, সাহিত্যচর্চা আপনার কম্ম নয়।'' কোনও উত্তর না দিয়ে লেখাটা অতুলবাবুর হাতে দিয়েই চরণ সেদিন বাড়ী চলে এসেছিল। ভদ্রলোকের কথায় মনে খুব আঘাত পেয়েছিল, একটু হতোদ্যমও হয়ে পড়েছিল, কিন্তু লেখালেখি বন্ধ করেনি। বরং নতুন উদ্যমে শুরু করেছিল সাহিত্যচর্চা, কেমন জানি একটা জেদ চেপে গিয়েছিল।

বলল, ''হ্যাঁ স্যার, ওখানেই কিছুদিন আগে একবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।''

ওনারও বোধ হয় মনে পড়ে গেল ঘটনাটা। বলে উঠলেন, ''হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার। আপনি সেদিন অতুলবাবুকে আপনার লেখা দিতে গিয়েছিলেন। আমাকেও দেখিয়েছিলেন লেখাটা।'

''হ্যাঁ স্যার। সেদিন আমার লেখা আপনার পছন্দ হয়নি, খুব খারাপ মন্তব্য করেছিলেন।''

''তাই কি ? কিন্তু এখন তো আপনি বেশ ভাল লেখেন। এত উন্নতি হল কি করে ? সত্যিই অবিশ্বাস্য!''

''ভাল আর কী স্যার ? মোটামুটি যেমন পারি লিখি।''

''না না, আমি আপনার এখনকার লেখা পড়েছি, সত্যিই খুব ভাল লেখেন আপনি। এরা যোগ্য লোককেই নির্বাচন করেছে।''

তারপর তার হাত দু'টো ধরে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, ''সেদিনের ব্যাপারটার জন্যে আমি খুবই লজ্জিত, কিছু মনে রাখবেন না প্লীজ। এই বয়সে লেখালেখি শুরু করে আপনি যেভাবে এত তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এসেছেন, তা খুব কম লোকই পারে। আপনার মধ্যে প্রতিভা আছে, আপনি জোর কদমে সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যান।''

''সবই আপনাদের আশীর্বাদ স্যার'' বলে পুনরায় নমস্কার করে চরণ নিজের আসনে গিয়ে বসল। ক্ষোভ অভিমান তো ছিলই না, বরং ভদ্রলোককে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগল তার দু'বছর আগেকার মন্তব্যের জন্যে।

❁ — ❁ — ❁

উপেক্ষিত লোকসংগীত

সূর্যকান্ত মাহাতো

বর্ষার এক ভেজা বিকেলে একজন প্রবীণ মানুষের সঙ্গে আড্ডায় বসে আছি। সামনেই ‘করম’ পরব আসছে সেই প্রসঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে গল্প ও আড্ডা জমে উঠল। তারপর হঠাৎ উনি গানের একটা সুর ধরলেন—

‘‘কলকা ফুল কলকা ফুল ফুটে লালে লাল গ
বিটি ছানার মিছাই জনম কাঁদিছে অন্তর গ।’’

একদম অন্তর থেকে অত্যন্ত দরদ দিয়ে উনি এই ‘‘জাওয়া’’ গানটি গাইলেন। বয়স জনিত কারণে একটু কষ্ট হল ঠিকই কিন্তু কী প্রচন্ড আবেগ নিয়ে উনি গানটি শেষ করলেন তা বলে বোঝোতে পারব না। গানের শেষে একটু দম নিয়ে বেশ একটা পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন। যেন বিরাট কিছু জয় করলেন। হ্যাঁ, জয়ই তো করলেন। একটা সময়কালকে। যেটা বর্তমান সময়ে হারিয়ে যাচ্ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। সেটাকেই উনি বাঁচিয়ে রেখেছেন এইসব লোকগানের মধ্য দিয়ে। প্রবীণ মানুষটির এই যে কাল কে পরাভূত করার জয়ের আনন্দ, সেটাই বা কম কিসের! পরে পরে উনি আরও কয়েকটা বাঁদনার গান, যেমন ‘‘অহিরে! জাগে তো অমাবস্যার রাতি’’ সেই একই রকম আবেগ আর উচ্ছ্বাস নিয়ে গাইলেন। গানের শেষে বাজনার বোলটাও গেয়ে দিলেন। ‘‘টুসুর মাগো টুসুর মা, তদের কী কী তরকারি’’ বলে একেবারেই ভিন্ন সুরে বেশ কয়েকটা টুসুর গানও শোনালেন।

মন্ত্র মুগ্ধের মতো আমরা শুনছিলাম। জঙ্গলমহলের মাটির সেই ধুলোমাখা গানে তখন আমরা অভিভূত। গানের রেশ তখনও আমাদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল তুলছে। ঠিক তখনই প্রবীণ মানুষটির গলায় শোনা গেল অত্যন্ত আক্ষেপের সুর। লোকগানের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা বাস্তবের মুখোমুখি এনে দাঁড় করালেন। বললেন, ‘‘এই সব মাটির গানগুলোর অবস্থা এখন চোখ ঝলসানো উজ্জ্বল ইলেক্ট্রিক বাতির কাছে হারিয়ে যেতে বসা লন্ঠনের মতো।’’ বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

সত্যিই তো। বর্তমান প্রজন্ম এইসব লোকগানে আজকাল তেমনভাবে আর নতুন করে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তাদের এই উদাসীনতা যে কতখানি প্রকট তা তো জঙ্গলমহলে চোখ রাখলেই বোঝা যায়। আসলে লোকসংগীত তো ততটা লিখিত নয়। কেবল এক প্রজন্ম অন্য প্রজন্মের কাছে থেকে শুনে শুনে শেখে এবং চর্চা করে করে সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু আজকের ছেলেমেয়েরা যেভাবে লোকসংগীত শিখনে তীব্র অনীহা প্রকাশ করছে তাতে লোকসংগীতগুলো কালের নিয়মে আর কতদিন বাঁচবে সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। এইসব প্রবীন মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো বা মাটির এই গানগুলোও একদিন হারিয়ে যাবে কালের গর্ভে। যেমনটা হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি, রামনগর, এগরা, দাঁতন অঞ্চলের অনেক পালাগান। যেমন ‘‘বাঘাম্বর পালা’’, ‘‘মাধব মালতি পালা’’, ‘‘চিড়িয়া চিড়িয়ানী পালা’’— হারিয়ে গেছে পুরানো ওস্তাতদের মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

আসলে লোকসংগীত তো আর এমনি এমনি ইচ্ছে বা খামখেয়ালি থেকে গড়ে উঠে না। এগুলো রিচুয়ালিস্টিক। কেবল লোকাচার, লোক উৎসব, লোকানুষ্ঠানের অঙ্গ

হিসাবেই গড়ে ওঠে। যেমন ভাদ্র মাসে ভাদু পুজোয় ভাদু গান, করম উৎসবে করম গান, জাওয়া গান, বাঁদনা পরবে বাঁদনার গান, মকর সংক্রান্তিতে টুসু গান এছাড়াও মনসা মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল ও ষষ্ঠী মঙ্গলের গান তো আছেই। সেই সঙ্গে আছে জঙ্গলমহলের প্রাণের ঝুমুর গান, ছৌ নাচের গান, পটুয়া গান এমনি আরও কত সব লোকগান।

সমগ্র জঙ্গলমহল জুড়ে এইসব লোকসংগীতগুলোকে আরও বেশি জীবন্ত করে রাখতে হলে চাই আরও বেশি করে তার চর্চা। বর্তমান প্রজন্মকে আগ্রহী হয়ে উঠতে হবে। এইসব গানের সুরে যে মাদকতা আছে, সুরের জাদুশক্তি আছে তাতে হারিয়ে যাওয়ার আকর্ষণ জন্মাতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই তীব্র আকর্ষণ বা আগ্রহ বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে সেরকমভাবে দেখা যাচ্ছে না। নতুন করে কোনও দল বা শিল্পীও আর সেরকম ভাবে উঠে আসছে না। দু একটা যা ব্যতিক্রম। হঠাৎ এমন সংকট তৈরী হলোই বা কেন ?

আসলে লোকজ এই সংগীতগুলো একসময় জনমানসে নানান ক্রিয়া বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। গ্রামের নারী পুরুষ সকলে সারাদিনের কায়িক পরিশ্রমের শেষে সন্ধ্যে থেকে রাত্রি পর্যন্ত সমস্ত জড়তা, ক্লান্তি, হতাশা, বিষণ্ণতা কাটাতে এইসব ভাদুগান, টুসুগান, করমগান, জাওয়া গান, মঙ্গল গীতি, কীর্তন, ঝুমুরের মতো লোকসঙ্গীতের আসর বসাতেন। বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে নারী পুরুষ সকলে নাচে ও গানে মেতে উঠতেন। নারীর যন্ত্রণা, ফসল ভালো হওয়ার মিনতি, দেব-দেবীর মহিমা প্রচার প্রভৃতি ছিল এইসব লোকগানের বিষয়। সেই সঙ্গে নিজেদের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিরহ-বেদনা সবই উপমা ও রূপকের মধ্য দিয়ে লোকগান গুলোতে ফুটিয়ে তুলতেন। রাগ, দুঃখ, কষ্ট ভুলে থাকতে এইসব লোকগানে অংশ গ্রহণ করতেন। এবং অপার আনন্দ লাভে জঙ্গলমহলের আকাশ বাতাসকে উদ্বেলিত করে তুলতেন গান ও বাজনার সুরে।

একদম প্রাচীন কালে এইসব লোকগানে নারী পুরুষ, ধনী গরীব সকলেই সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতেন এবং অনন্দে মেতে উঠতেন। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে একটা অংশ সরে আসতে থাকে। শারীরিকভাবে তারা আর অংশ গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মনে সেই আনন্দের খোরাকটুকু চিরকালই বেশ তাজা। তাই সরে আসা শ্রেণীর লোকগুলো প্রথম অংশের নাচে আর গানের আনন্দেই নিজেরা আনন্দ পেতে শুরু করল। আর এভাবেই দুটো শ্রেণি গড়ে উঠল। একটা অংশ হয়ে উঠল দর্শক ও শ্রোতা। অন্য অংশটা শিল্পী বা দল। আর দিন যত এগিয়েছে দর্শক ও শ্রোতার সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে, অন্যদিকে শিল্পী ও ওস্তাদের সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করছে। আর আজ সেটা পারদ অঙ্কেরও নিচে নেমে গেছে।

ওই প্রবীণ মানুষটি সহ অনেকেই মেনে নিয়েছেন, এ হল সময়ের দোষ। এই আধুনিক ঝাঁ চকচকে সময়কালের প্রবল হাঁ মুখটাই একটু একটু করে গিলে খেয়ে নিচ্ছে সমস্ত প্রাচীনতাকে। প্রতিটি ঘন্টা মিনিট সেকেন্ড আমাদেরকে নানান ব্যস্ততা আর প্রতিযোগিতায় বেঁধে ফেলেছে। দীর্ঘ অবসরের অবকাশ আজ স্বপ্ন। মনের কোমলতা আর পেলবতাটাই একটু একটু করে যেন জমাট বেঁধে গেছে। মাদলের ধিতাং ধিতাং, নাগাড়ার গুমগুম, ধমসার সুরের গলা টিপে ধরেছে ডিজে সাউন্ড। আমরা মাটির সুরের মাদকতায় নয় বরং বেসুরো আধুনিক সাউন্ডের কাঠিন্যে আনন্দ পাচ্ছি। মুঠোফোন আমাদের সহজাত

বৈশিষ্ট্যগুলোকে আরও বেশি করে কৃত্রিম করে গড়ে তুলেছে। সরল জীবনযাত্রায় আরও অনেক বেশি বাঁক এসে পড়েছে এবং জীবনকে আরও বেশি জটিল করে গড়ে তুলছে।

শুধু তাই কী ? সেই সঙ্গে সময়ের দোসর হয়েছে বিশ্ব অর্থনীতির বাজার। বাজারের থলি থেকে হৃদয়ের সুরের তন্ত্রগুলোতেও ঢুকে পড়েছে অর্থনীতি। ঘরের অলিন্দ হয়ে মনের অলিন্দে কখন যেন ঢুকে পড়েছে নানান যান্ত্রিক ক্লাসিক্যাল সংগীত। চিত্ত বিনোদনের ভরপুর মশলা সংগীত কেড়ে নিচ্ছে একটু একটু করে গ্রামীণ লোকগীতিগুলোকে। এক একটা সমাজের ধারক ও বাহক এই লোকসংগীতগুলো তাই ধীরে ধীরে যেন তার নিজস্ব জৌলুস হারিয়ে ফেলছে।

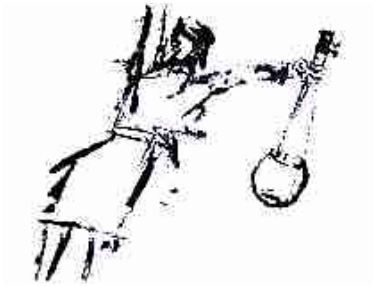

অথচ শাল সেগুন পলাশে মোড়া জঙ্গলমহলের গ্রামগুলোতে বর্ষায় চাষের কাজ শেষ হয়ে গেলে শরতের চাঁদনি আলোয় ভেসে বেড়াত লোকগানের হৃদয় নাচানো সুর। মাদলের ধিতাং তাল, করতালের ঝনঝন, খোলের বোল, হারমোনিয়ামের পিঁ পিঁ শব্দ, লাগড়ার গুমগুম আকাশে বাতাসে তখন ভারী হয়ে অপূর্ব এক সুর ও ছন্দ তৈরি করত। দুঃখের বিষয় এখন আর সেইসব গানের আসর তেমন একটা আর বসে না। কোথাও কোথাও যদিও বা দু একটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখনও সেই আসর বসে, সেখানে প্রায় সকলেই প্রবীণ মানুষ। নতুন প্রজন্মের কাউকে সেই আসরে দেখা যায় না।

তবে এটুকু আশার কথা এই যে জঙ্গলমহলে এখনও 'অহিরে' সুরে বাঁদনা পরবে গরু জাগানো কিংবা গরু খুঁটানের গানগুলো, কিংবা ঝুমুরের মতো অনুষ্ঠানগুলো এখনও কিছুটা প্রাণবন্ত। সেই সঙ্গে পৌষ সংক্রান্তিতে খাল নদী ও বাঁধের পাড়ে টুসু ভাসানের যে ''পরকুল'' উৎসব, সেখানে টুসু গানের সুর ও মাদকতা এখনও কিছুটা তার জৌলুস ধরে রেখেছে। কেবল এগুলোই জঙ্গলমহলের মৃতপ্রায় লোকগানগুলোর গোড়ায় এখনও কিছুটা হলেও জল সিঞ্চন করে চলেছে। তবে জানি না সেটাও কতদিন এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে।

❁ — ❁ — ❁

রোমন্থন

প্রদীপ মাহাত

কালিহীন দোয়াতটা বার কয়েক ঠক ঠক করে মেঝেতে ছুঁড়ে দিল সুমন, কেমন একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাচ্ছে সে, মা বোধ করি মেঝেতে গোরব ন্যাতা দিচ্ছে। ওমা ওমা বাবা লাঙ্গল নিয়ে গেছে যে তুমি ভাত পৌঁছাতে যাবে না ? মেঝেতে নিকোতে থাকা মায়ের গলা জড়িয়ে সুমন বার কয়েক একই প্রশ্ন করতে থাকল।

মা বুঝতে পারে তার ছেলে কি বলতে চাইছে ? হ্যাঁরে বাবা হ্যাঁ তোকে নিয়ে যাব। তরকারির বাটিটা কিন্তু আমি বয়ে নিয়ে যাব মা। মায়ের সম্মতি পেয়ে সুমন আহ্লাদে আট খানা হয়ে নাচতে লাগল। জমিতে লাঙ্গলরত বাবাকে ভাত পৌঁছাতে যাওয়া ব্যাপারটা যেন

একটা উৎসব মনে হয় তার। শ্রাবণের ভরা বর্ষায় বিল থই থই জলে অর্ধেক চষা জমির আলের ধারে জোয়াল সমেতে গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে আলের উপর টিফিন বাটির ঢাকনা খুলে বাবা যখন খেতে বসে বাড়ি থেকে ভরপেট খেয়ে আসা সুমনের মনের খিদাটা যেন চাগিয়ে ওঠে। সুমন কিছু বলার আগেই বাবা তার জন্য টিফিন বাটিটা খুলেই ডাক দেয় বাবু ভাত খাবে ? সুমন প্রায় নাচতে নাচতে বাবার কাছে গিয়ে বসে। কামিনগুলোর চারা তোলার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ আর চষা মাটির স্নানের সাথে সাথে সুমন ভাতের গ্রাস তোলে। আঃ কি তৃপ্তি! খাওয়া হলে তোলা চারাগুলো যেখানে রোপন করা হবে, সেই কাদা জমির এখানে ওখানে ছুঁড়ে এই কর্মযজ্ঞের অংশিদার হওয়ার চেষ্টা করে আট বছরের ছোট সুমন। তার মাও কামিন গুলোর সাথে হাত লাগায় চারা তোলার কাজে। আবার বর্ষণ শুরু হল, সুমনকে একটা বাঁশের ছাতা ধরিয়ে গাছতলায় পাঠিয়ে দেয় তার বাবা। সে নিরীক্ষণ করে ঘর্মাক্ত কর্দমাক্ত স্নাত বাবার কঠিন মুখ। দৃঢ় সুকঠিন এক হাতের তালুতে মুষ্টিবদ্ধ লাঙ্গলের বোঁটা অন্য হাতে লাঠি উঁচিয়ে হেঁটে চলেছে তার কৃষক বাবা। আর মা ? রঙ্গীন পলিথিনের মোড়কে আবৃত হয়ে মাথা নিচু করে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ধানের চারা তুলে চলেছে একদল মহিলার সাথে। নানান রঙে ভরে উঠেছে মাঠের চারদিক। বাবা ও বাবা আমি মই-এ চড়বো। মই এ চড়েছে সুমন, বাবার পায়ের কাছে শিকল ধরে বসে। আহা আজ কি আনন্দ! আজ কি আনন্দ!

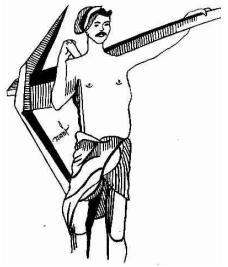

বিচিত্র মিউজিক এর ছন্দে দামি বিলিতি দেওয়াল ঘড়িটা জানিয়ে দিল বারোটা বেজে গেছে, মখমলের মতো নরম বিছানা থেকে ধড়মড়িয়ে উঠল বছর ত্রিশের সুমন মাহাত। বাইরে তাকিয়ে দেখে এখনো ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে উইকেন্ডের এই দিনটা তার নিজস্ব। পেশায় সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার, কর্মসূত্রে চেন্নাই এর এই বিশাল অ্যাপামেন্টেটাতে তেতলায় একটি বিলাস বহুল ফ্ল্যাট উপহার পেয়েছে কোম্পানির তরফ থেকে। চাকরি পেয়ে আর দেরী করেনি, মাকে নিয়ে এসে উঠেছিল ফ্ল্যাটে। বাবা বছর দশেক আগেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছেন। তাই মাকে আর কাছ ছাড়া করেনি। বিছানা ছেড়ে সুমন লিফটের দিকে পা বাড়ায়। রাস্তায় নেমে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ছোঁটার পরিমাপ নেয়। আজ তাকে ভিজতে খুব ইচ্ছে করছে। সে ছুটতে থাকে রাজপথ ধরে, একটা গোরু রাস্তার পাশে বসে, সুমন দাঁড়িয়ে পড়ে, গোরুটা নিজের মনে জাবর কাটতে থাকে। সুমন ভাবে ইস যদি এর মতো জীবনটাও হতো তাহলে অতীতটা এভাবে রোমন্থন করা যেত, তবে উগরে বের করে বলদটার মতো জাবর কাটতো অতীতটাকে। আর দেরী করে না সে সোজা ফ্ল্যাটে ফিরে যায়। Laptop টা খুলে অফিসে একটা মেল করে, মা ও মা শব্দে ফ্ল্যাটটা মাথায় করে তোলে। কিচেন থেকেই মা উত্তর দেয় কি হলো কি বাবা ? মা লাগেজ রেডি করো মা দেশের বাড়ি যাব। ফ্লাইটের টিকিট কেটে নিয়েছি।

❁ — ❁ — ❁

অমল ও বইওয়ালা

অরুণাভ বীর

আড্ডাটা আমাদের ছিল পান্থসখায়। সেখানে গল্পের ঝুলি নিয়ে আসতেন অমলদা।একের পর এক গল্প শোনাতেন এক এক দিনে। গল্পগুলোর বিষয়বস্তু আমাদেরকে রোমাঞ্চিত করত। হৃদয় হরণকারী গল্পগুলোকে ছাপার অক্ষরে দেখার জন্য বায়না করতাম। এই বায়নার কচকচানির জন্য অমলদা শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে কলকাতার এক প্রকাশকের দারস্থ হন। কিন্তু এর পরেই শুরু হলো সমস্যা। দিনের পর দিন যায় বই আর ছাপানো হয় না। প্রকাশক প্রায়ই বলেন এই হচ্ছে-হবে।

একদিন বৃষ্টির মধ্যে ঐ প্রকাশনা সংস্থার কাছে যাওয়ার সময় অমলদার বাদাম ভাজা খাওয়ার ইচ্ছা হয়। বাদাম খেয়ে অভ্যাস বশতঃ ঠোঙার কাগজটির দিকে চোখ পড়তেই অমলদার চক্ষু চড়কগাছ। দেখে কিনা তাঁর পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা। মনের দুঃখে সেই দিন থেকে আর বই ছাপানোর দিকে পা মাড়ান নি।

❁ – ❁ – ❁

জঙ্গলমহলের পরিচিত মেছো প্রবাদ ও ধাঁধাঁ

রাকেশ সিংহ দেব

ইংরেজি Proverb শব্দটির বাংলা অর্থ হল 'প্রবাদ'। মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাত্রার বহুমুখী অভিজ্ঞতা প্রবাদের মধ্যে দিয়ে যথার্থভাবে ফুটে ওঠে। ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা জঙ্গলমহলের প্রচলিত ধাঁধাঁ ও প্রবাদের মূল উৎস। লোকায়ত জ্ঞান প্রতিফলিত হয় প্রবাদের মধ্য দিয়ে। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রীতিনীতির অসঙ্গতি ব্যঙ্গ বক্রোক্তির মধ্য দিয়ে প্রবাদের আকারে বানীরূপ লাভ করে। সামাজিক অসঙ্গতি, ব্যক্তিমানুষের অসঙ্গতি, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর পেশাগত অসঙ্গতি সকলই প্রবাদ বাক্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। সেইজন্য 'Oriental Proverbs' গ্রন্থে বলা হয়েছে- ''Proverb photographs the varying lights of social usages / the experience of an age is crytalised in the piyhyaphorism.'' কৃষি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় মানভূমের বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনজাতিরা প্রকৃতির বিচিত্র খামখেয়ালিপনা বিশেষভাবে অনুধাবন করেছিল। তাদের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির গুণে প্রকৃতি এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের বিচিত্র লীলা এখাকার মানুষের কথ্যে প্রবাদ আকারে উঠে এসেছে। তবে প্রবাদ জনজাতিদের কাছে পরিচিত- 'ডাকপুরুষ্যা কথা' হিসেবে, কারণ প্রবাদ এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষের মধ্যে পরম্পরায় প্রবাহিত হয়।

কয়েকটি প্রচলিত প্রবাদঃ

১) 'হিড় পাট গাছে ঘুঘি।'
('হীড়' = বড় ক্ষেত। 'ঘুঘি' = মাছ ধরার ফাঁদ। প্রচুর বর্ষায় বড় ক্ষেতের হীড় বা আল ভেঙে গেলে ঘুঘি পাতবার জায়গা থাকেনা।)

২) 'লাপিত মরে পিতে, জাইল্যা মরে শীতে।'
(সারাদিন ক্ষৌরকর্মে ব্যস্ত থাকায় সময়ে না খাওয়ার জন্য নাপিত পিত্তরোগে ভোগে।

মাছ ধরতে গিয়ে সারাদিন ভিজা কাপড়ে থাকার জন্য জেলেদের ঠান্ডা লেগে অসুখ করে।)

৩) 'নদী পাইরালে, কেঁওট শালা।'
('কেঁওট' = জেলে। তারা প্রায়ই চুরি করে মাছ ধরে পালায়। সেই মানসিকতা বোঝাতে এই প্রবাদের অবতারণা।)

৪) 'আঘাইল্ বঘের্ পুঁঠি তিতা।'
('আঘাইল' = যার পেট ভর্তি রয়েছে বা পেটভর্তি খাওয়া। 'বঘ' = বক। ধানবান ব্যক্তির ধনলাভের প্রতি অনীহা।)

৫) 'শাগের মধ্যে পুই, মাছের মধ্যে রুই।'
নিজ নিজ প্রজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।)

৬) 'বাঁধা খাঁক্ড়ি ছায়ের বশ্।'
('খাঁকড়ি' = কাঁকড়া। বে-কায়দায় পড়লে সকলেই কাবু হয়।)

৭) 'ইঁচ্লা দিয়েঁ শোল বাঝ্হা।'
'ইচলা = চিংড়ি মাছ। 'বাঝহা = জড়ানো। ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ স্বার্থ চরিতার্থ করা।)

৮) 'শোল ছেল পোলুয়ে
কিকরে গ্যাল পালায়ে।'
(পলু বা পলোই, বাঁশের সরু কাঠি দিয়ে তৈরি মাছ ধরার যন্ত্র। যা দিয়ে কম জলে জিওল মাছ ধরা হয়।)

৯) 'মাছ ও অতিথি তিনদিন পরে বিষ।'
(একই মাছ দীর্ঘদিন ধরে জমিয়ে খেলে তার কোনও পুষ্টিগুণ অবশিষ্ট থাকে না। সেই মাছ শরীরের জন্য ক্ষতিকর। অতিথি অধিক দিন গৃহস্থ বাড়িতে থাকলে তার মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। সম্পর্ক বিষিয়ে যায়।)

ধাঁধাঁ কথাটি মূলত সংস্কৃত শব্দ 'ধন্দ থেকে এসেছে। বঙ্গীয় শব্দকোষ গ্রন্থে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, ধাঁ ধাঁ - সঃ ধন্দ- ন্ধ > ন্দা - ধন্ধা = সংশয় বা ভ্রম বা মূঢ়তা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। ধাঁধাঁ শুধু ধন্ধ লাগায় না, বুদ্ধিদীপ্ত বিভ্রম সৃষ্টি করাই ধাঁধাঁর কাজ। জঙ্গলমহলের লোকসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। ধাঁধাঁর মধ্যে পরিশীলিত চিন্তা ও সূক্ষ্মবুদ্ধির অনুশীলন অপরিহার্য। অনেক সময় রূপকের আশ্রয়ে ধাঁধাঁ গড়ে ওঠে, ফলে সেই রূপকের অন্তর্নিহিত গুঢ় অর্থ যথার্থভাবে অনুধাবন করার জন্য উত্তরদাতাকে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিতে হয়। প্রচলিত লৌকিক ধাঁধাঁগুলির মূল আশ্রয় হয়ে ওঠে কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য আদিবাসী মানুষজনের প্রকৃতি পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন উপদান। ধাঁধাঁকে ঝাড়গ্রামে 'ফোড়োই' বা 'ঢক' বলা হয়। ধাঁধাঁর মধ্যে যে পরিশীলিত মন ও বুদ্ধাঙ্কের পরিমাপ করবার চেষ্টা থাকে তাতে সঠিক উত্তরদানের মাধ্যমে উত্তরদাতার পাশাপাশি উপস্থিত সকলের মনন অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়।

কয়েকটি প্রচলিত ধাঁধাঁ :

১) 'মইধ্ বাঁধে ঘটি টাঁঙা।'

('মইধ্' = মধ্য বা মাঝ। 'বাঁধে' = পুকুরে। 'টাঙা' = ঝোলানো।)
উত্তর- শালুক ভেঁট বা শালুক ফল।

২) 'মই বাঁধে পস্তর কুচড়ি।'
('কুচড়ি' = ধান চাল রাখবার খড় নির্মিত গোলাকার পাত্র।)
উত্তর- শালুক ভেঁট বা শালুক ফল।

৩) 'মইধ্ বাঁধে কাড়ার লাদ্'।
('মইধ্' = মধ্য বা মাঝ। 'বাঁধে = পুকুরে। 'কাড়া' = পুরুষ মোষ। 'লাদ' = গবাদি পশুর মল।)
উত্তর- কচ্ছপ।

৪) 'পাঁকের ভিতর সুই ছল্কে।'
('ছল্কে' = পিছলে যায়)
উত্তর- বান মাছ বা বাইন মাছ / তুইড্।

৫) 'আগলি পেছলি একই চাইল্।'
('আগলি পেছলি' = সামনে পিছনে। 'চাইল' = চলন।)
উত্তর- কাঁকড়া।

৬) 'যতেক ডাগর খাসি, একই কুইট্যা মাস।'
('ডাগর' = বড়। 'কুইট্যা মাস' = মাংসের টুকরো।)
উত্তর- গুগলি (শামুক) / গেঁড়্হা।

৭) 'ডাকাত এসে বাড়ি ঘিরলো হাতে দড়ি-দড়া
জানলা দিয়ে ঘর পালালো, গেরস্থ পড়ল ধরা।।'
উত্তর- জালফেলা।

প্রবাদই হোক বা ধাঁধাঁ তা নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার চিহ্ন। এর মধ্যেই নিহিত থাকে তার সামাজিক-মানসিকতা, ইতিহাসবোধ, আত্মনির্মিতির উপকরণ। লেখা সাহিত্যের সমান্তরালে দাদু নাতি চোদ্দপুরুষের মৌখিক পরম্পরায় এইসব প্রবাদ ধাঁধাঁর জন্ম-মৃত্যু ঘরগেরস্তি। এই মানুষের সিংহভাগ নিরক্ষর, হাত তার শ্রম জর্জরিত কিন্তু এই মানুষেরা বহুদর্শী অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ।

❁ — ❁ — ❁

ইতিহাস ঝাড়গ্রাম রাজ প্যালেস

লক্ষীন্দর পলোই

দানবীর নরসিংহ মল্লদেবের শিক্ষক ও ঝাড়গ্রাম জমিদারীর রাজ প্রশাসক দেবেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য- এর প্রচেষ্টায় ইন্দ্র পূজার ইঁদ একাদশীর তিথিতে জঙ্গলমহলের সমগ্র প্রজাদের উপস্থিতিথিতে শালখুঁটি পুঁতে ১৯২২ সালে ঝাড়গ্রাম রাজ প্যালেসের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়।কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আরকিটেক্ট কে দিয়ে মুসলিম- গথিক শৈলীতে ঝাড়গ্রাম রাজপ্যালেস গড়ে তোলেন। মন্ডলী প্রথাকে নতুন করে সাজিয়ে কাঠ চুরি বন্ধ করে নতুন ফরেস্ট গার্ড নিয়োগ করে জঙ্গল নিলাম দিয়ে রাজ প্যালেসের জন্য অর্থ যোগাড় করেন। কলিকাতা থেকে বিশিষ্ট জনদের নিয়ে এসে, যেমন-ইঞ্জিনিয়ার ভাদুড়ী,

ক্ষিতীশবাবু এবং ব্যারিষ্টার প্রেমেন মিত্র, ডি.জি. ধীরেন গাঙ্গুলী, অধ্যাপক সুকমল দত্ত প্রমূখদের দেখাশুনোর মধ্যে দিয়ে ১৯৩১ সালে গড়ে ওঠে আজকের এই ঝাড়গ্রাম রাজ প্যালেস।

কী ভাবে গড়ে উঠল ঝাড়গ্রাম মল্লরাজবংশ, জঙ্গলখণ্ডে তখন মাল রাজাদের আধিপত্য, প্রাচীন মল্লভূমে মল্ল রাজাদের আধিপত্য কমতে থাকলে, ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হয়। মল্লরাজারা দুর্বল হয়ে পড়েন। ঝাড়গ্রাম তখন জঙ্গলখণ্ড নামে পরিচিত ছিল। আইন-ই-আকবরীতে জঙ্গলখন্ড নামটি পাওয়া যায় ।১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবরের নির্দেশে রাজা মানসিংহ ও অম্বর বঙ্গ জয়ের জন্য রাজস্থানের দুজন বিশস্ত সেনা নায়ক সর্বেশ্বর সিংহ এবং বীর হাম্বির ও বেশ কিছু রাজপুত সেনা নিয়ে গভীর জঙ্গলখন্ডে আসেন।জঙ্গলখন্ডে তখন উপজাতিদের বসবাস সাঁওতাল, মাল, ভূমিজ এবং লোধা প্রমূখ। মালরাজারই তখন জঙ্গলখন্ডে রাজত্ব করতেন। মৌর্য ও গুপ্ত আমলে মালদের ক্ষমতা বেশি ছিল। মাল জাতি ছিল আবার মল্ল ক্ষত্রিয় এবং শক্তিশালী। তারা জৈনধর্মাবলম্বী বলে বলা হয়ে থাকে। কেউ আবার মল্ল ক্ষত্রিয়ও বলেছেন। মল্ল বংশের শাসন ছিল বলে একে মল্লভূমও বলা হতো। সর্বেশ্বর সিংহ ও বীর হাম্বির মাল রাজাদের পরাজিত করেন। বীরহাম্বীর বিষ্ণুপুর রাঢ়খন্ডে থেকে গেলেও সর্বেশ্বর সিংহ রাজা মানসিংহের সাথে রাজপুতানায় ফিরে যান। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নেন তিনি জঙ্গলখন্ডে ফিরে যাবেন এবং মুঘল সুবাদার হিসেবে রাজত্ব করবেন।

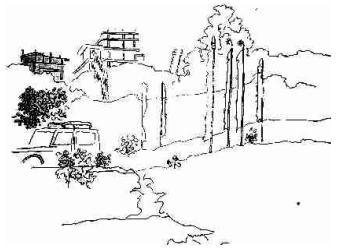

যদিও ঝাড়গ্রাম মল্ল রাজবংশ নিয়ে নানান জনশ্রুতি আছে, যেমন— বাঁকুড়ার মল্ল বাগদি সর্দার আদি মল্ল দ্বাদশ শতাব্দীতে ঝাড়গ্রামে রাজত্ব করতেন। আবার জনশ্রুতি রাজস্থান থেকে একদল তীর্থযাত্রী পুরী জগন্নাথ দর্শন করতে এসেছিলেন তখন রঘুনাথ হারিয়ে যান এবং বাঁকুড়ার লাউ গ্রামের সর্দার তাকে মানুষ করে রাজা করে তোলেন। আবার কেউ বলেন— কোনও এক উপজাতি সর্দারকে রঘুনাথ হত্যা করে ৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মল্লাব্দ চালু করে ইন্দ্র। তিথিতে ইন্দ্র পূজা করে সিংহাসনে বসেন। তবে অনেকে বিষ্ণুপুরের মল্লদের সঙ্গে ঝাড়গ্রাম মল্লদের মিলিয়ে কল্পকাহিনীর কথা বলেন যা ঠিক নয়।

আরকাইভস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়-১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্থানের মাড়োয়ার রাজ্যের সর্বেশ্বর সিংহ ঝাড়গ্রামের মালদের পরাজিত করে প্রথম ঝাড়গ্রাম রাজ পরিবার প্রতিষ্ঠা করেন। মাল রাজকে খড়্গ দিয়ে সাবিত্রীদেবীর কাছে বলি দেন বলে জনশ্রুতি আছে। সেই থেকে প্রতিবছর পটের দুর্গায় বেল বরণ ও অষ্টমীর দিন খড়্গ বরণ করা হয় এবং পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। পরে মাটির মানুষের প্রতিমা তৈরী করে নরবলি দেওয়া হতো। মল্ল আইন অনুসারে মল্লদেব উপাধি গ্রহণ করেন ও মল্ল নিয়ম অনুসারে বিজয়া দশমীর দিন দশেরা উৎসব পালন করেন।

সর্বেশ্বর সিংহ ছিলেন জাতিতে ক্ষত্রিয় চন্দ্র বংশীয় চৌহান, ফতেপুর সিক্রীর রাজপুত। তিনিই ঝাড়গ্রাম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তখন রাজ পরিবার গৃহটি ছিল সাধারণ খড়ের ছাউনি যুক্ত মাকড়া পাথরের বাড়ী, তবে তাকে সুরক্ষিত করার জন্য দুর্গের চারপাশে পরিখা নির্মাণ করেন এবং 'মল্লউগালযগুদেব' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড শক্তিশালী।

ষাঁড়ের সাথে লড়াই করতেন। তিন মণ ওজনের শালকাঠের মুগর ভাঙতেন, খেজুর গাছের শাখাগুলিকে পাক দিতেন, লোহার গরদগুলিকে খেলার ছলে কৌশল দেখাতেন বলে জানা যায়। উগালকথার অর্থ উঁচু আল বা প্রাচীর। উগালবেষ্টিত গড়ের মধ্যে মল্ল বা বীরষণ্ড বিরাজমান করেন বলে তাঁকে 'মল্লউগালষণ্ডদেব বলা হতো। রাজপরিবারের দলিলে 'মল্লউগালষণ্ডদেব' কথাটি পাওয়া যায়। ঝাড়গ্রাম রাজপরিবারের রাজ্য সীমানা ছিল উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ পর্যন্ত। নয়াগ্রামে এখনো উগালষণ্ড হাট বসে। নয়াগ্রাম অঞ্চলে উগালষণ্ডদেবের পূজো প্রচলিত আছে। রাজা সর্বেশ্বর মল্ল উগালষণ্ডদেব থেকে রাজা নরসিংহ মল্ল উগালষণ্ডদেব পর্যন্ত এই উপাধি গ্রহণ করতে দেখা যায়।

সর্বেশ্বর মল্ল উগালষণ্ডদেব-এর পর ঝাড়গ্রাম রাজ্যের রাজা হন বীর বিক্রম মল্ল উগালষণ্ডদেব। তিনি ছিলেন প্রজাকল্যাণকর, ধার্মীক। তাঁর সময় ধলভূম মল্লরাজাদের অধীনে আসে। তিনি একটি লেঠেল বাহিনী তৈরী করেছিলেন বলে জানা যায়। ঔরঙ্গজেবের সময় এক ফরমান বলে তিনি ধলভূম জমিদারি পেয়েছিলেন। বীর বিক্রম-এর পর রাজা হন বীরভীম, তারপর রাজা হন পৃথ্বীনাথ মল্ল উগালষণ্ডদেব। পৃথ্বীনাথের মৃত্যুর পর রাজা হন সংসার মল্লদেব। এই সময় মল্লভূমের উপর মারাঠাদের আক্রমণ ঘটলেও গভীর জঙ্গলখন্ডে মারাঠারা প্রবেশ করেনি। কটোয়ার যুদ্ধে নবাবের বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে ভাস্কর রাও পঞ্চকোট হয়ে তারা বিষ্ণুপুর এর দিকে চলে যায়। ১৭৪০ থেকে ১৭৪৫ এর মধ্যে মারাঠারা উড়িষ্যা ও বিষ্ণুপুর এবং চন্দ্রকোনা হয়ে মেদিনীপুর আক্রমণ করে। বিষ্ণুপুরে কামানের ঘায়ে শিবির ছেড়ে মারাঠারা মেদিনীপুরে পালিয়ে আসেন। ১৯৪২ সালে ভাস্কর রাও ও নিলু পণ্ডিত বারো হাজার অশ্বারোহী নিয়ে উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর আক্রমণ করেন। ১৭৬০ সালে মারাঠা সেনাপতি শিউ ভট্ট বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন, তবে উনি ঝাড়গ্রাম রাজ্যের উপর আক্রমণ করেননি।

১৫৯০ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত মল্ল ইতিহাসে মুঘল পর্বের সমাপ্তি কাল। এরপর শুরু হয় নবাবি আমল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীর কাশীম কোম্পানিকে বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার দেওয়ানী স্বত্ব দিলে, ফার্গুসন ঝাড়গ্রাম আক্রমণ করেন। কিন্তু উগালবেষ্টিত সশস্ত্র পাইক সেনা বিষাক্ত তীরযুক্ত ধনুক, ঢাল, তরোয়াল, টাঙ্গি, বল্লম ও গভীর জঙ্গলাকীর্ণ রাজদুর্গ আক্রমণ না করে ফার্গুসন সন্ধির প্রস্তাব দেন এবং বার্ষিক করের বিনিময়ে মিত্রতা স্থাপিত হয়।

১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দ মল্লদেব বার্ষিক ৩০০ টাকার বিনিময়ে কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ মেদিনীপুর ও রাধানগর হয়ে ঝাড়গ্রামে আক্রমণ করলে রাজা শ্যামসুন্দর মল্লদেব পাইক বাহিনী নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তিনি চূয়াড় বিদ্রোহে অংশ গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে ৫০০ টাকা বাৎসরিক করের বিনিময়ে ইংরেজদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা ঝাড়গ্রাম জমিদারি দখল করে। এই সময় ইংরেজদের রাজস্ব আদায়কে কেন্দ্র করে জঙ্গলমহলে ব্যাপক গণ আন্দোলন দেখা দেয়। ঝাড়গ্রাম গড়, রামগড়, চিল্কিগড়, লালগড়, বেলেবাড়াগড়, রোহিনীগড়, কুলটকরীর চাঁদনীগড়, রাইবুনিয়াগড় সান্তালগড়, ধলভূমগড় প্রভৃতি। গড় রাজ্যগুলিতে পাইক, বরকন্দাজ ও লাঠিয়ালরা বিদ্রোহ

শুরু করে। ইংরেজরা একে চুয়াড় বিদ্রোহ বলে দমন করে। ১৮০৫ ভূমিবেষ্টিত অঞ্চলগুলিকে নিয়ে জঙ্গলমহল নামে নতুন একটি জেলা গঠন করে। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামসুন্দর মল্লদেবের সময় কালেক্টর আলেকজন্ডার হিকিন্স ঝাড়গ্রাম পরগনা, চিয়াড়া পরগনা, কাঞ্চননগর নিয়ে ঝাড়গ্রাম রাজ্য তৈরী করেন। ১৮৩২ সালে জঙ্গলমহল জেলার অবলুপ্তি ঘটানো হয়। এরপর রাজা হন বিক্রমাদিত্য। ১৮৭৫ সালে তিনি মারা যান। ঝাড়গ্রাম জমিদারি কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডের অধীনে চলে যায়। এরপর রাজা হন নারায়ণ মল্লদেব। তিনি বার্ষিক ৪০০ টাকা কর দেওয়ার শর্তে জমদারী ফিরে পান।

নারায়ণ মল্লদেবের মৃত্যুর পর রাজা হন রঘুনাথ মল্লদেব। তিনি ছিলেন বিদ্বান, ধার্মীক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর রাজত্বকালে ঝাড়গ্রাম রাজ পরিবারের বিস্তার লাভ ঘটে। তিনি সর্বেশ্বর মল্লদেবের মতো শক্তিশালী ছিলেন। তিনি ভৈরব ও শিবের ভক্ত ছিলেন।তিনি ভালো খেলাধূলা করতেন, লোহার রডকে হাত দিয়ে বাঁকিয়ে বিভিন্ন ধরনের করুকার্য দেখাতেন। ১৮৮৪-৮৫ সালে পিছিয়ে পড়া জঙ্গলমহলে তিনিই একমাত্র এফ এ পাশ করেন। তাঁর সময়ের অনেক খেলাধুলোর সরঞ্জাম কোলকাতার যাদুঘরে রাখা আছে। তাঁর বিয়ে হয়েছিল শিলদা রাজবংশের কন্যা রাজকুমারী রাজলক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে। রাজলক্ষ্মীদেবী ছিলেন আধুনিকা ও অমিতব্যায়ী, তিনি ভালো পোশাক পরিধান করতেন ও রাজকীয়ভাবে থাকতেন। তিনি তখনকার দিনে এক টাকা দামের চালের ভাত খেতেন। তাঁর রোজ খরচের হিসেব ছিল এক হাজার টাকা। তবে রাজলক্ষ্মীদেবী প্রজাকল্যাণকামী ছিলেন। তিনি রাজাকে দিয়ে তিন লাখ টাকা গরীব প্রজাদের দান করেছিলেন। ১৯১২ সালে রঘুনাথমল্লদেব মারা যান। এরপর রাজা হন চন্ডীচরণ মল্লদেব। কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। মেদিনীপুর নিয়ে যাওয়ার পথে ধেড়ুয়ার ঘাট পার হতে না হতে তিনি মারা যান। তখন ডিসপেন্সারি নামে একটি চিকিৎসালয় ঝাড়গ্রামে স্থাপন করা হয়। ১৯১৬ সালে চণ্ডীচরণ মারা যাওয়ার পর ঝাড়গ্রাম রাজপরিবারে অন্ধকার নেমে আসে। তখন চন্ডীচরণ-এর পুত্র নরসিংহ মল্লদেব ছিলেন নাবালক। ঝাড়গ্রাম রাজপরিবারের জমিদারি কোর্ট অফ ওয়ার্ডস এর অধীনে চলে যায়। রাজমাতা কুমুদকুমারীর অনুরোধে মেদিনীপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক দেবেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য কে নরসিংহ মল্লদেবের শিক্ষক নিয়োগ করা হয় এবং পরে কুমুদকুমারী দেবেন্দ্র মোহনকে ঝাড়গ্রাম জমিদারীর প্রশাসক পদে নিয়োগ করেন। দেবেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য ছিলেন সৎ ও বিচক্ষণ। তিনি কিভাবে ঝাড়গ্রাম জমিদারী-কে উন্নত করা যায় তার চেষ্টা করেন। নরসিংহকে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে মেট্রিকুলেশান করিয়ে মেদিনীপুর কলেজে আই-এ পড়ার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি করান। মেদিনীপুরে ঝাড়গ্রাম রাজাদের দুটি কাছারি বাড়ি ছিল। যেখানে জমিদারি আইন বিষয়ক কাজ হতো। ১৯২৯ থেকে ১৯৫০ সাল ছিল ঝাড়গ্রাম এস্টেট-এর সুবর্ণ যুগ। এই সময় ১৯২২ সালে কোলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আদলে প্রায় ৮১ বিঘা জমির উপর মুঘল ও রাজপুতানার ঘরানায় কথিক স্থাপত্য শৈলীতে বর্তমান রাজবাড়ির ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৯৩১ সালে ঝাড়গ্রাম রাজপ্যালেস পরিপূর্ণতা লাভ করে। তিন মহলা রাজবাড়ি হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। প্রধান ফটক, জলহরি পুকুর, বাহির মহল, কাছারি

বাড়ি, খাবারের ঘর, জলের ফোয়ারা, ফুলের বাগান, পাঠাগার, আর.এম.এস ক্লাবঘর, রাধারমনের মন্দির, শিব মন্দির, ব্যায়মাগার প্রভৃতির সমন্বয়ে ঝাড়গ্রাম রাজ প্যালেস খ্যাত হয়।

নরসিংহ মল্লদেব শুধু রাজা হিসেবে নয়, সুগায়ক, বাদ্য বিশারদ, চিত্রশিল্পী ফটোগ্রাফার, (সুইজারল্যান্ড, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর এবং রাশিয়া থেকে তিনি ফটোগ্রাফার এর জন্য বিশ্বমানের উপহারও পেয়েছেন) শিকারী এবং প্রজাবৎসল ও সাহিত্যানুরাগী কীর্তনের প্রতি ছিল প্রবল অনুরাগ। পটের দুর্গা ও দুর্গারূপী সাবিত্রী, ইঁন্দ্রধ্বজ প্রভৃতি উৎসবও তিনি পালন করতেন। কুমুদ কুমারী স্কুল, রানী বিনোদ মঞ্জুরী রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বাণিভবন, শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাপীঠ কন্যা গুরুকুলের জন্য জমি দান মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর হল, ফুটবল স্টেডিয়াম— এ সবই নরসিংহ মল্লদেব ও দেবেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এর অবদান। সাহিত্য অনুরাগী হিসেবে তাঁর নাম স্মরণীয়, কারন কোলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বঙ্কিম সমগ্র রচনাবলী প্রকাশে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দশ হাজার টাকা দান করেন। বঙ্গিয় সাহিত্য পরিষদ তাঁকে পরিষদের 'বান্ধব' শ্রেণীভুক্ত করেন। এছাড়া দিল্লীর কালিবাড়িতেও তাঁর অবদান আছে। দানশীলতার জন্য ১৯২০ সালে ভারত সরকার 'রাজা' ও 'ও-বি-এ' (অফিসার অফ দ্যা ব্রীটিশ এম্পায়ার) উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৫০ সালে দেবেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য মারা যান। তাঁর মৃত্যুকে ঝাড়গ্রামের ইন্দ্রপতন বলা হয়। ঝাড়গ্রাম ও ঝাড়গ্রামরাজকে আধুনিকতার দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলো। কংগ্রেস হল দেশের শাসক। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। পি.সি. ঘোষ-এর সঙ্গে নরসিংহ মল্লদেবের ভলো বন্ধুত্ব ছিল, পি.সি. ঘোষই রাজাকে কংগ্রেস-এ যোগদান করান। তিনি রানীবিনোদ মঞ্জুরী নামে মেয়েদের স্কুলটিকে গভর্নমেন্ট হাইস্কুল বলে মঞ্জুর করান। পি.সি. ঘোষ নরসিংহ মল্লদেবকে খাদ্যমন্ত্রী করবেন বলে কথা দিয়ছিলেন। কিন্তু তার আগেই মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরে যান। ড. বিধান চন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনিও রাজার বন্ধু ছিলেন এবং রাজাকে স্নেহ করতেন। বিধানবাবুই নরসিংহ মল্লদেবকে প্রথমে এম.এল.এ এবং পরে এম.পি. করেন। এই সময় ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ সরকারি কলেজে রূপান্তরিত হয়। ঝাড়গ্রাম ইলেকট্রিসিটি ও টাউনশিপ, জুবলি সেলিব্রেশান নিয়ে জুবলি মার্কেট তাঁরই অবদান। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও পি.কে.সেনকে দিয়ে করানোর ইচ্ছে ছিল। ১৯৭৬ সালে ১১ই নভেম্বর কোলকতায় নরসিংহ মল্লদেব মারা যান। নরসিংহ মল্লদেব-এর পুত্র বীরেন্দ্র বিজয় মল্লদেব। তিনি তিনবার কংগ্রেস থেকে পশ্চিমবঙ্গ ঝাড়গ্রাম বিধানসভার এম.এল.এ নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ভালো ক্রিকেটার ছিলেন। তাঁর দুই ছেলে শিবেন্দ্র বিজয় মল্লদেব ও জয়দীপ মল্লদেব বর্তমানে রাজপরিবারের উত্তরাধিকারি। শিবেন্দ্র বিজয় মল্লদেব ঝাড়গ্রাম-এর প্রাক্তন পৌরপিতা। তাঁর পুত্র বিক্রমাদিত্য মল্লদেব। জয়দীপ মল্লদেব-এর পুত্র হর্ষবর্ধন মল্লদেব হলেন পরবর্তী প্রজন্ম। তবে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্যটন-এর জন্য মূল ফটকের বাইরে হেরিটেজ গড়ে তুলেছেন।

ঝাড়গ্রাম জেলার ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য

অমর সাহা

পশ্চিমবাংলার বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুর দুই বিভাজনের মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাকে বিভাজিত করে গড়ে ওঠে ঝাড়গ্রাম জেলা। আটটি ব্লক (নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল, গোপীবল্লভপুর ১ ও ২, বিনপুর ১ ও ২, জাম্বনী, ঝাড়গ্রাম) নিয়ে এই জেলার আত্মপ্রকাশ। এখানকার বেশিরভাগ মানুষ কুড়মি সম্প্রদায়। এছাড়া মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাদী জনগোষ্ঠীর বসবাস এই জেলায়। নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুরের সঙ্গে ওড়িশার যোগাযোগ রয়েছে। এই গোপীবল্লভপুরের উপর দিয়ে চৈতন্যদেব পুরী যাত্রা করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বইতে এই অঞ্চলটির নামকরণ করেছিলেন 'ঝারিখন্ড'।সুকুমার সেন এখানকার উপভাষার নামকরণ করেন 'ঝাড়খন্ডী' উপভাষা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নাম দিয়েছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ী। বিনপুর-২ ব্লকটি ঝাড়খন্ড রাজ্যের সীমানায়। ঝাড়খন্ড রাজ্যের মাতৃভাষা হিন্দি হওয়ায় সবাই হিন্দি মিডিয়ামে পড়ে। ফলে ওপারে হিন্দি আর এপারে বাংলা মাতৃভাষা। একসময় পুরুলিয়াও ঝাড়খন্ড তথা বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ফলে বিনপুর-২ বেলপাহাড়ি এলাকায় হিন্দির প্রভাবও রয়েছে। ঝাড়গ্রাম জেলার তিনটি ব্লকে ওড়িয়া প্রভাব রয়েছে যেমন, তেমনি রয়েছে একটি ব্লকে হিন্দি ভাষার প্রভাব।

ঝাড়গ্রাম জেলায় হিন্দি ভাষার প্রভাব যত না বেশি তার চেয়ে ওড়িয়ার প্রভাব বেশি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন ও মোহনপুরে ওড়িয়ার প্রচলন বেশি। নয়াগ্রামের খড়িকামাথানিতে সাতদিন থাকাকালীন এই এলাকার মানুষের সঙ্গে সময় কাটানোর সময় কথাবার্তা সংগ্রহ করি। তার মধ্যে একটি হল— ''সাতবেউনি ঠাকুরের পূজায় বসিছন পূজারী। গাঁর কেত্তে লুক পূজার ডলা লেইকি ঠাকুরর পূজা দেইতে আসিচন। কেউ মানসিক করিচি গটে ছেলি আবলে কেউ বা দুটিয়া, কেউ বা ষোলআনা, আবলে কাহার বি বিস্তর অসুক করিচি। সেই দিয়ার ঠাকুরর কোতর ধারণা দেইছি। ঠাকুরের নাম ডাক বা তাঁকর দয়ার কথা বিস্তর। অসুক করিচি, সেই সময়র যদি সিত্র সেই ঠাকুরকু মানসিক করে তাহানে তাহার ইচ্ছা পূরণ হেই যায়। আউ সেই সাতবেউনি ঠাকুরর পূজা করন পদু মাঝি। সেই দিয়ার তাঁকর নাম ডাক বিস্তর খিলা। গাঁর ভিরত এছু তাঁকর অবস্থা ভালা। ঠাকুরের নামর সিত্র কেত্তেবার কেত্তে লুকর উপকার হেইছে। এই ভাবর তাঁকর আয় বেশ হেইথায় আউ বিস্তর সন্মান পাইথান।'' (শুভেন্দু পাত্র, খড়িকামাথানি)

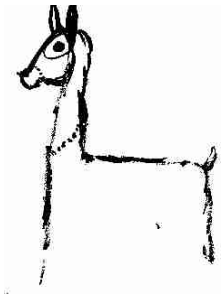

বাংলা মান্যচলিতের সঙ্গে ভাষার মিল নেই। এই মিল ওড়িয়া ভাষার সঙ্গে বেশি। পাশেই সুবর্ণরেখা নদী বাংলা ও উড়িয়ার মধ্যে সীমানা হিসেবে চিহ্নিত। ওপরে বারিপদা জেলা, ওখানে বাংলার বহু মানুষের বাস। বারিপদাতে গিয়েও দেখেছি অনেক পরিবারে বাংলা ও ওড়িয়া সংবাদপত্র পাঠ করতে। ফলে এই সুবর্ণরেখা নদীর দুই পার্শ্ববর্তী এলাকার ভাষাকে অনেকে সুবর্ণরৈখিক উপভাষা নামে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই এলাকার মানুষের ভাষা বিভাজন করা কঠিন কাজ। রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সীমারেখা ভাষার সীমারেখা হতে পারে না। তাছাড়া ওড়িশার সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে একত্রে মিলিত হন অনেকে। একই রূপ পরিলক্ষিত হিন্দি ভাষার ক্ষেত্রে। ঘাটশিলাতেও এই দৃশ্য দেখা যায়। কিংবা চাকুলিয়া পরবর্তী এলাকাতে হিন্দির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

উপরের লেখাটিকে রূপতাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখবো—

১. ঠাকুরর(অ) পূজায়— অধিকরণ কারকে 'র' বিভক্তি এখানকার উপভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগ।
২. কেতে > কত (বাংলা)
৩. লুক > লোক। ও > উ। বঙ্গালি উপভাষায়ও এরূপ শোনা যায়।
৪. কেই > কেউ, উ-র বদলে ই এখানকার ভাষার আর একটি লক্ষণ।
৫. গটে > একটি। ওড়িয়া ভাষার প্রচলিত।
৬. ছেলি > ছাগল (পাঁঠা)। ছেলি শব্দটি মধ্য বাংলায় মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে রয়েছে।
৭. দুটিয়া > দুটো। বাংলাদেশে দুইট্যা (অপিনিহিতির ফলে)
৮. কাহার > কারও। সাধুরীতির মান্য বাংলায় ব্যবহৃত।
৯. সেই দিয়ার > সেই জন্য
১০. অসুক > অসুখ। ঝাড়খন্ডী উপভাষার লক্ষণ।
১১. সিত্র— সেখানে।
১২. ঠাকুরকু > ঠাকুরকে। কর্মকারকে কে> কু বিভক্তির প্রয়োগ।
১৩. তাঁকর > তার
১৪. ভালা > ভালো।
১৫. ঠাকুরের (অ) নামর > ঠাকুরের নামে। সম্বন্ধ পদের 'ওর' বিভক্তি এবং অধিকরণ কারকে 'র' বিভক্তি।
১৬. কেতে লুককু > কতো লোককে। কর্মকারকে 'কু' বিভক্তির প্রয়োগ।

১৭. এই ভাবর (অ) – এইভাবে। অধিকরণ কারকে 'র' বিভক্তি।
১৮. ওড়িয়া ভাষায় থা > থিব প্রভৃতি যোগে যৌগিক ক্রিয়ার কাল গঠন দেখা যায়, 'মাইথান'।
১৯. এখানে অসমাপিকাক্রিয়ার রূপের ক্ষেত্রে ভাষার বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন, জাগিয়া-জাগি / জাগি করি, ধুইয়া-ধুই / ধুই করি, খাইয়া- খাই/ খাই করি, ফেলাইয়া-ফিঁকি।
২০. যৌগিক ক্রিয়ার রূপেও কিছু তফাৎ রয়েছে। যেমন, কহিয়া ফেলা > কহা, দেখাইয়া দেওয়া > দ্যাখেই দিয়া, গিলিয়া ফেলা > গিলিপকা, উঠিয়া যাওয়া > উঠি যাওয়া। এই শব্দ ব্যবহার আবার কুড়মালি ভাষা প্রয়োগের এক বিচিত্র রূপ।
এখানে নঞর্থক ক্রিয়ার রূপ না আবার নি রূপে উচ্চারিত হয়। এই গুলি ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন, যাবেনা >যাবুনি, আসেননি > আইসেননি।
২১. স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার ঝাড়গ্রাম জেলায় ব্যাপক প্রচলিত। যেমন— হবেক, যাবেক, খাবেক ইত্যাদি। কুড়মালি ভাষায় এর প্রয়োগ দেখা যায়।
২২. মান্য চলিত বাংলার 'গুলি' 'গুলো' বহুবচনে 'গা' যোগ হয়। যেমন, 'টাকাগা' (ছেলেগুলো), ছেলিগা (ছোগলগুলি)।
২৩. 'গেদে', 'দমে' শব্দযোগে বহুবচন করা হয়। যেমন, গেদে লোক হইয়াছে ম্যালায়। দমে আম ধরেছে গাছে।
২৪. লিঙ্গগত দিক দিয়ে এখানে বেশ কিছু আঞ্চলিক শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যেমন, কুনা (বালক)- কুনি (বালিকা), পেঁড়রামুহা (পঁড়রিমুহি), মাউসা (মেসো)-মাউসি (মাসি)।
২৫. পেশাঘটিত শব্দ প্রয়োগ করে স্ত্রীলিঙ্গ বোঝানো হয়। যেমন, হাঁড়িমায়া, নাপিতমায়া।
২৬. পুরুষবাচক শব্দের আগে স্ত্রী বাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রী লিঙ্গ করা হয়। যেমন, পো (ছেলে)-

মাইপো (মেয়ে), আঁড়িয়া হাতি- মাই হাতি।
২৭. আবার ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেও এখাকার ভাষার লিঙ্গভেদ বোঝানো হয়। যেমন, হালিয়া (বলদ)-গাই, খাসি (ছাগল)-ধইড়, বদা (ছাগল)-পাঁঠা, বর-কনিয়া, পুতরা (ভাইপো)-মিয়ারি (ভাইঝি)।

ধাতু, ক্রিয়ার রূপের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রূপ দেখা যায় ঝাড়গ্রাম জেলার ভাষা বৈচিত্র্যে। এখানকার বাংলা ভাষাতেই এত বৈচিত্র্য, যেখানে সেখানে সাঁওতালি ও কুড়মি ভাষার প্রভাবও কম নয়। সাঁওতালদের অভিবাসন সম্পর্কে জানা যায় ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন-শোষণে আদিবাসীরা বাস উঠিয়ে চলে যান। তখন জমিদার-রা বুঝতে পারেন চাষ না হলে খাজনা দেওয়া সম্ভব নয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে। তখন জমিদাররা সাঁওতালদের সাদর আমন্ত্রণ জানান। সাঁওতালরা জঙ্গল কেটে আবাদী জমি তৈরি করে দীর্ঘস্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তারপর তারা বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়েও পড়ে।

ঝাড়গ্রাম জেলার ভাষা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কুড়মি (মাহাত) সম্প্রদায়। এদের অভিবাসন সম্পর্কেও লোকশ্রুতি আছে। ঝাড়গ্রামের রাজা পঞ্চকোটের রাজকন্যাকে বিয়ে করে নিয়ে এলেন। তিনি ঝাড়গ্রামের ভূমিজ মুন্ডাদের কৃষিকর্মজাত ধানের চালের ভাত খেতে পারছিলেন না বলে রাজা পঞ্চকোট (শিখরভূম) থেকে দক্ষ চাষী কুড়মি-মাহাতদের এখানে যৌতুক প্রজা হিসেবে আনেন। তাদের বসবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে চাষবাস করান। সেই থেকে কুড়মি-মাহাতরা নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতিসহ এখানে বসবাস করেন। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ লিখেছেন- "By Aryans who as Hindus of Kurmi caste... occupied their old village sites... The Ancestors of the present Mahatos who eastward former settlements between Kasai and Subarna-rekha river"[১] পশুপতি মাহাতো লিখেছেন— ''গোণ্ড ও অন্যান্য শক্তিশালী কৃষকগোষ্ঠী দ্বারা উৎপাটিত হয়ে (কুড়মিরা) আরাবল্লি পাহাড় ধরে কৈমুর পর্বতশ্রেণি পার হয়ে বর্তমান মধ্যপ্রদেশের 'সুরগুজা রতনপুর' এলাকাতে এসে পৌঁছান। সূর্য (ধর্ম) উপাসক এই গোষ্ঠীর সঙ্গে ওঁরাও, অসুর, আগারিয়া গোষ্ঠীর এই অঞ্চলে সাক্ষাৎ হয় এবং পারস্পরিক লেনদেন অব্যাহত থাকে। তখন এই অঞ্চলে কৃষিকাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। তখন তারা 'ঝুমচাষ' বা 'ডাহিচাষ' করতেন। ...সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজপতি, দেশমন্ডল, পরগোনাৎ, পোটলইদের দাপটে যাদের নানান কারণে সমাজচ্যুত করা হয়েছিল, যাদের পতিত ঘোষণা করে জল, ঘটিবন্ধ, আগুনবন্ধ, বিবাহশাদী,আত্মীয়তার লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হল তারা বেদিয়া-কুড়মি বা বেদিয়া বা ছোটো কুড়মি হিসেবে চিহ্নিত হলেন। এই সময় চাষী কুড়মি বা চাষী সাঁওতালদের আকাঙ্ক্ষা ছিল খেয়ে পরে বাঁচার চাইতে উদ্বৃত্ত নিয়ন্ত্রণকারী বা উৎপাদনকারী হওয়া। তাই হাজারিবাগের দামোদর উপত্যকার জমি যখন কুললো না তখন অতি দ্রুত গতিতে সপ্তদশ শতাব্দীতেই তারা ঢুকে পড়লেন মানভূম, সিংভূম, রাঁচি অঞ্চলের কংসাবতী সুবর্ণরেখার উপত্যকাতে।''[২]

ডালটন সাহেব লিখেছেন— "There are other high families of the Kurmi origin Siadhia in the descendant of Kurmi patel of satara and the Bhousia family were originally patels of deori and alo. I believe Kurmis."[৩] ড. বিনয় মাহাতোর মতে— ''ডালটনের এই ধারণাকে অভ্রান্ত বলে ধরে নিল কুর্মীদের যে বর্গী হাঙ্গামার সময় মহারাষ্ট্র অঞ্চল থেকে ঝাড়খন্ড অঞ্চলে আসা সম্ভব এই অভিমতকে স্বীকার করে নিতে হয়।[৪]

পশুপতি প্রসাদ মাহাতো ঝাড়গ্রামের কুড়মি জাতি সম্পর্কে বলেছেন— ''খেরোয়াল জাতিসত্তার কুড়মি গোষ্ঠীর একটি অংশ, যারা 'বেদিয়া' নামে পরিচিত তারা 'তপশিলি' জাতিভুক্ত।[৫] ঝাড়গ্রামের আর একটি ছত্রিশগড় রাজ্যের পশ্চিম দিক থেকে মোগলদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসে। এরা দুই শ্রেণির-ডানদিক দিয়ে যারা শাড়ি বা ফ্রক গোটায় তারা বাঁয়া আর যারা বাম দিক দিয়ে শাড়ি বা ফ্রক গোটায় তারা দৈন্য বা ডাঁয়া। দ্বিতীয় মতটি হল, ওড়িশার রাজা চোড়গঙ্গদেব দুটি সম্প্রদায়ের মেয়ে বিয়ে করেন—সদগোপ ও জলঅচল গোষ্ঠী। সদগোপ মহিলার সন্তানেরা দৈন্য বা ডাঁয়া আর জলঅচল মহিলার সন্তানেরা বাঁয়া বা বায়ান। এই শ্রেণির বায়ানরা আঠা যাযাবর নামে পরিচিত। তৃতীয় মতে, এরা ধলভূমের ধোপা রাজার বংশধর। রজক থেকেই এসেছে রাজু শব্দটি।

বর্তমানে ঝাড়গ্রাম জেলায় বেশ কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের বসবাস দেখা যায়। এরা কর্মসূত্রে, চাকরিসূত্রে এখানে এসে বসবাস করছেন। ফলে ঝাড়গ্রাম জেলাতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক মিলনমূলকতার সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'। ঝাড়গ্রাম জেলা আজ এক নতুন তীর্থভূমি। পশুপতি প্রসাদ মাহাতো লিখেছেন— ''ছোটনাগপুর মালভূমির হড়-মিতান'' সামাজিক সভ্যতার ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, খেড়িয়া, নাগেশিয়া, তাঁতি, কামার, কুম্ভার, বেদিয়া, কুড়মি, ডোম, চিকবড়াইক, গইজুঁ কোরোয়া, ভূমিজ, হো (কোল) তথা বহু অন্যান্য ছোটো ছোটো গোষ্ঠী, যেমন— বাগাল, দেশওয়ালী, পুরাণ, মুচি, ডোম, কোল, কামার প্রভৃতি গোষ্ঠী নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে দেশান্তরী হয়ে আজ যে অঞ্চলে তারা স্থানীয় মেচ, রাঙা, পোলিয়া, রাজবংশী, টোটোদের সঙ্গে বসবাস করে তীব্র জীবনসংগ্রাম করে এক সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তুলেছেন।[৬]

চলমান জীবনধারায় ঝাড়গ্রাম আজ অনেক উন্নত। জঙ্গলমহলের এই অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক কারণে উত্তপ্ত হলেও এখানকার মানুষ শান্তপ্রিয় ও পরস্পরের সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক আচরণ করে।

তথ্যপঞ্জি:

১) Ghosh, Benoy— Culture Profile of India
২) মাহাতো, পশুপতি প্রসাদ— ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ
৩) Dalton E. T. Descriptive Ethonology of Bengali
৪) মাহাত, বিনয়— লোকায়ত ঝাড়খন্ড
৫) পূর্বোক্ত
৬) মাহাতো,পশুপতি প্রসাদ— ঝাড়খণ্ডের হড়মিতান (খেরোয়াল) সামাজিক সভ্যতা, শিল্প চেতনা ও জীবন রসবোধ।

● — ● — ●

ভাষা যখন অন্তরায়

জ্যোৎস্না সোরেন

জগৎ জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে টিকে থাকার লড়াইয়ে, যে সমাজ আজও নিজস্ব ঘরানা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে তার মূলে আছে ভাষা। ভাষা দেশ-কাল-জাতি-সমাজ সমকালের ধারক ও বাহক। লোকাচার ও দেশাচার পেরিয়ে জাতির, জাতি সত্তার পরিচয় বহন করে ভাষা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন... ''মাতৃভাষা, মাতৃদুগ্ধ সম''। এই মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে শিশু তার পরিচয় দেশ ও দশের সামনে তুলে ধরে।

আদিবাসী জাতির গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ভাষা শুধুমাত্র নিজেদের গোষ্ঠীতেই সীমাবদ্ধ হওয়ার দরুণ একদিকে যেমন জাতি তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে; অন্যদিকে আদান প্রদান ও ব্যবহারিক ভাষা (কথ্য ভাষা আর লেখ্য ভাষা) প্রাচীন গোষ্ঠীগুলিকে রপ্ত করতে হয়েছে। মূল ধারার ভাষাভাষীরা, আঞ্চলিক গোষ্ঠীর মাতৃভাষার প্রতি বিদ্বেষ মূলক মনোভাব পোষণ করেন এবং হেয় প্রতিপন্ন করেন সেই ভাষার মানুষদের।

এছাড়াও নিজস্ব ঘরানা বজায় রাখার পিছনে ছিল ভাষার প্রতিবন্ধকতা। ভাষার দুরূহতার জন্যই অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আদান প্রদান সেভাবে মূলস্রোতে এসে মেশেনি। যা সমাজ সংস্কৃতির অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখতে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

আবার এই ভাষার দুরূহতার জন্যই আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা *প্রথমত:,* ভাষা বৈষম্যের শিকার হয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালয়গুলিতে। *দ্বিতীয়ত:,* যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করে তাদের উচ্চশিক্ষায় বাধা হয় সেই ভাষা-ই। মাতৃভাষায় উপযুক্ত বই, উপযুক্ত শিক্ষার পরিকাঠামো না থাকার জন্য শিক্ষার্থীরা অন্য শাখায় যেতে পারে না। *তৃতীয়ত:,* জব ওরিয়েনটেড পঠন পাঠনের সীমিত সুযোগ, নেই বললেই চলে। ফলে, প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়াকে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ছাড়া অন্য কোনো শাখায় যেতে হলে তার অন্য বিষয়ে যথেষ্ট দখল থাকতে হবে, এবং ভাষা রপ্ত করতে হবে।

ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত যতগুলি প্রাচীন জাতি আছে, তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি বর্তমান। সংখ্যাগরিষ্ঠে আদিবাসী জাতিগুলির মধ্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী এগিয়ে। জনসংখ্যার নিরিখে বিহার, ছত্রিশগড়, ওড়িশার পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। মোট জনসংখ্যার সাত শতাংশ মানুষ সাঁওতাল জনগন। তার মধ্যে চার শতাংশ মানুষ মাতৃভাষা সান্তালি ও ''অলচিকি লিপি'' পড়তে ও লিখতে পারেন। আগামী দুহাজার পঁচিশ এ (২০২৫) অলচিকি লিপির স্রষ্টা পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে ''মিশন-অলচিকি ২০২৫'' এর কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক যে প্রাচীন জাতিগুলি, সেই মানব জাতির প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হলে প্রাচীন জাতিগুলির কৃষ্টি কালচার, সংস্কৃতি, ভাষা, রীতিনীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আর্কিওলজিস্টরা এই তত্ত্বে আস্থা রেখেছেন যে, ডি.এন.এ-র নমুনার মধ্য দিয়েই

যে জাতির ইতিহাস বেড়ে ওঠা, পরম্পরা নির্ভর করে এমন নয়; বরঞ্চ জাতির কৃষ্টি কালচার রীতিনীতি, ভাষা, দর্শন, ধর্ম থেকে সহজেই অনুমেয় এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির নৈকট্য, বেড়ে ওঠা এবং সমসাময়িক সভ্যতার আরও খুঁটিনাটি।

এ পর্যন্ত বিশ্বে প্রায় ৭,১১১ টি ভাষা আছে। কিন্তু মাত্র ২৩ টি ভাষা অর্দ্ধেকের বেশি মানুষ কথা বলার জন্য ব্যবহার করে থাকেন। এগুলি বিভিন্ন ভাষা পরিবারের অন্তর্গত। সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা যদিও সংস্কৃতকেই ধরা হয় এখনও পর্যন্ত। বিশ্বের পাশাপাশি ভারতবর্ষেও যে সমস্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠী বর্তমান... তাদের ভাষাগুলি হারিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে।

আধুনিক প্রজন্মের কাছে গ্রহণযোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে সার্বজনীন কথ্য ও লেখ্য ভাষার প্রতি আবেদন বেশি। যে ভাষা মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম, তার মধ্যে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি সাবলীলতায় ও প্রয়োজনীয়তায় এগিয়ে। এছাড়াও আধুনিক নব্য আদিবাসী সমাজের মানুষদের ভাষার প্রতি মমত্ববোধ হারিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান নব্য আদিবাসী সমাজ দ্বিখণ্ডিত এই ভাষাকে কেন্দ্র করেই। শিক্ষিত বনাম অশিক্ষিত। অধিকাংশ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ তাঁদের সন্তানদের লেখ্য ভাষায় শিক্ষিত করতে গিয়ে কথ্য ভাষা বা মাতৃভাষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন না। অন্যদিকে অশিক্ষিত মানুষের ভাষা মুখের ভাষা... মাতৃভাষা নিজ গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে পূর্বপুরুষদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে। শিকড়ের সন্ধানে নব্য প্রজন্মরা আর খোঁজেনা অতীত। ভাষা রপ্ত করার পাশাপাশি, আরও আধুনিক হতে গিয়ে নব্য আদিবাসী সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের নিজের জাতি, ধর্ম, কৃষ্টি কালচারকে অস্বীকার করার পাশাপাশি জাতে ওঠার ট্রাডিশনও পরিলক্ষিত।

ভাষার মধ্য দিয়ে নিজ সমাজের প্রতি যে দায়িত্ব কর্তব্যবোধ দেখা দেয়, ভাষার অজ্ঞতার হেতু সেই বোধে চিড় ধরে। যে জাতি নিজের কৃষ্টি কালচারকে অস্বীকার করার পাশাপাশি জাতে ওঠার ট্রাডিশনও পরিলক্ষিত। ভাষার মধ্য দিয়ে নিজ সমাজের প্রতি যে দায়িত্ব কর্তব্যবোধ দেখা দেয়, ভাষার অজ্ঞতার হেতু সেই বোধে চিড় ধরে। যে জাতি নিজের কৃষ্টি কালচার জানেনা, সে জাতি মূঢ়, যে মানুষ অত্মপরিচয় বহন করতে পারেনা সে অজ্ঞ ও অপদার্থ। সাজাত্যাভিমান প্রতিটি মানুষের অহংকার ও অলংকার। বর্তমানে সাঁওতাল ঘরানার রীতিনীতিতে আধুনিকতার মিশেল।

সমস্ত স্বাধীকার, কৃষ্টি কালচার, ভাষা-ধর্মের পুনরুদ্ধার করতে হলে; প্রাচীন গোষ্ঠীর ভাষা বাঁচিয়ে রাখতে হলে সরকারের আনুকুল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা জরুরী। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিত, বহু প্রাচীন ভাষা কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে।

● — ● — ●

আমার চোখে জঙ্গলমহল

সুমন্ত কর্মকার

বরাবরের ইচ্ছা ছিল জঙ্গলমহল নামের সাথে বাস্তবের মিল খোঁজার। সেই মত ঘুরে বেড়িয়েছি এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে। কখনো ঝাড়গ্রাম থেকে বেলপাহাড়ি, ঝিলিমিলি, বলরামপুর, চরিদা হয়ে ঝালদা। তো কখনো পুরুলিয়া থেকে মানবাজার, মুকুটমনিপুর, রানিবাঁধ, ছেঁদাপাথর, ফুলকুশমা হয়ে লালগড়। আবার কখনও নয়াগ্রাম থেকে গোপীবল্লভপুর, চিচড়া, গিধনী, কানাইসর, ধাঙ্গিকুসুম হয়ে কাঁকরাঝোড় অর্থাৎ জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

সত্যিই এখানকার ভূপ্রকৃতি, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা প্রণালী একটু অন্যরকম তা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। এখানকার কিছু কিছু জায়গা টিলা, টিকর, ডুংরি ও ছোট বড় পাহাড় থাকায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এতটাই বৃদ্ধি করেছে যা এককথায় অবর্ণনীয়। রয়েছে পাহাড়ের কোলে তৈরি হওয়া কিছু কিছু প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম হ্রদ (যেমন - কেটকি, খান্দারানী, তারাফেনী, আমঝর্ণা, খইরাবেড়া, মুরগুমা, মুকুটমণিপুর সহ আরও) যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরো বাড়ানোর সাথে সাথে বহু মানুষের জীবন জীবিকাকে রঙিন করে তুলেছে। আবার এই অঞ্চলে উৎপন্ন হওয়া কিছু নদী যেমন দুলুঙ, তারাফেনী, ভৈরববাকি, কংসাবতী সহ আরো কয়েকটি নদী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাড়ানোর সাথে সাথে বহু মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এখানকার তরঙ্গায়িত মালভূমি ছোট বড় পাহাড়ি উপত্যকা, নদী নালা, হ্রদ বা জলাশয় সহ এখানকার অনুর্বরমৃত্তিকায় বেশিরভাগ জায়গায় প্রচুর পরিমানে পর্নমোচী উদ্ভিদ সৃষ্টি হওয়ায় জায়গায় জায়গায় হালকা থেকে ঘন জঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছে। অন্যান্য অনেকের মতে বা বাইরের দৃষ্টিতে এই অঞ্চলের হালকা থেকে গভীর জঙ্গলের পরিমান ও সংখ্যা বেশি থাকায় এই অঞ্চলকে জঙ্গলমহল বলে থাকে অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে জঙ্গলের আধিক্যের কারণে জঙ্গলমহল মনে হলেও এর পেছনে আরও অন্য কারণ রয়েছে তা হলো— অন্যান্য অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষের যেমন প্রধান জীবিকা চাষবাস তেমনি এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষের প্রধান জীবিকা বনজ সম্পদ। কারণ এখানে উর্বর চাষযোগ্য জমির পরিমান কম তাই জঙ্গলের উপরেই নির্ভরশীল হতে হয়। যেমন—

(১) জঙ্গলে শাল গাছ থেকে পাতা সংগ্রহ করে পাতার থালা ও বাটি তৈরি করা হয় যা পরিবেশ বান্ধব। আবার শাল গাছের আঠা সংগ্রহ করে ধুনো হিসেবে বাজারে বিক্রি করার কাজেও অনেকে যুক্ত থাকে।

(২) পিয়াল গাছের পাকা ফল কয়েকদিন জলে ভিজিয়ে তারপর রৌদ্রে শুকিয়ে কালো আস্তরণ ছাড়িয়ে জামসেদপুর, রাঁচি সহ বড় বড় শহরের বেবিফুড কোম্পানিতে বিক্রি করা হয় কারণ এই ফলের গুঁড়ো থেকে বেবিফুড তৈরি হয়।

(৩) জঙ্গলের মাঝে মাঝে পাহাড়ি ঢালু জমিতে বাবুই ঘাস হয়ে থাকে। এই বাবুই ঘাস থেকে বাবুই দড়ি তৈরি হয়ে থাকে। এই কাজেও প্রচুর মানুষ যুক্ত থাকেন।

(৪) কেন্দু পাতা সংগ্রহে অনেক মানুষ যুক্ত থাকেন কারণ এই কেন্দু পাতা থেকেই বিড়ি তৈরি হয়। জঙ্গলে প্রচুর ছোট ছোট কেন্দু গাছ থাকে এবং সেই পাতা সংগ্রহ করে অনেকেই উপার্জন করে থাকেন।

(৫) মহুল জঙ্গলমহলের আরেক অর্থকারী গাছ কারণ মহুলের ফল থেকে যে তেল পাওয়া যায় তা সাবান শিল্পে কাজে লাগে আবার মহুয়া থেকেও আর্থিক উপার্জন হয়ে থাকে। এই কাজেও অনেকে যুক্ত থাকেন।

৬) বর্তমানে পলাশ ফুল থেকে সুগন্ধি ভেষজ আবির তৈরি হওয়ায় অনেকেই যুক্ত থাকেন পলাশ ফুল সংগ্রহে।

৭) জঙ্গলে শুকনো কাঠ সংগ্রহেও অনেকে যুক্ত থাকেন কারণ ছোট বড় কল কারখানা সহ ইটভাটাগুলোতেও প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

৮) কুরকুট নামক এক প্রকার লাল পিঁপড়ের ডিম যা বনজ সম্পদ হিসেবেই ধরা হয় কারণ এর পুষ্টিগুণ থাকার কারণে এর চাহিদা প্রচুর। এই কুরকুট সংগ্রহে অনেকেই যুক্ত থাকেন।

৯) বর্ষার সময়ই জঙ্গলে শুকনো গাছের পাতা পচে কুরকুড়ি, কারাম, বালি সহ একাধিক সুস্বাদু প্রোটিন যুক্ত ছাতু পাওয়া যায় যার চাহিদা দূর দূরান্ত পর্যন্ত থাকে। ফলে এই কাজেও অনেকে যুক্ত থাকেন।

১০) কেন্দু ভুডরু, কুসুম, খেজুর সহ একাধিক সুস্বাদু বনজ ফল সংগ্রহ করে থাকেন অনেকে কারণ বাজারের চাহিদা থাকায় আর্থিক উপার্জনও হয়ে থাকে।

সুতরাং জঙ্গলমহল নাম যুক্তিযুক্ত ও সার্থক। আরো সবুজে সবুজ হয়ে সবুজ গাছে ভরে উঠুক জঙ্গলমহল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আরো বেড়ে উঠুক, বাড়ুক পক্ষীকুল সহ বন্য প্রাণীর সংখ্যা। মানুষের মনে ভরে উঠুক আনন্দের সঞ্চার। পথ প্রশস্ত হোক আর্থিক উপার্জনের। ভালো থাকুক সকলে। আনন্দে থাকুক জঙ্গলমহল।

❁ — ❁ — ❁

রানী সাগর

নলিনী বেরা

''ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি
আছে আমাদের পাড়া খানি
দীঘি তার মাঝখানটিতে
তালবন তারি চারিভিতে''

জ ল জল। কথায় বলে জলই জীবন। 'জ'-এ জনম 'ল'-এ লয় বা মরণ। জীবন আর মরণ— এই দুই নিয়েই তো জীবন। আমাদের টুসু গানে আছে —

''জলে হেলা জলে খেলা
জলে তোমার কে আছে।
মা-বাপ ছাড়া সবাই আছে গো
জলে শ্বশুরঘর আছে।।''

জল ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। শুধু মানুষ কেন— পশুপাখি পোকামাকড় গাছপালা কেউই না। তাই জলের ধারেই তারা বাস করে, বাসাবাঁধে। ধারে কাছে জলাশয় না

থাকলে জলাশয় খনন করে নেয়। আর আমাদের দেশ ত ধনধান্যে গ্রামে গ্রামে ভরা। গ্রামবাংলার শরীর যদি হয় গ্রাম, তাহলে জলাশয় তার প্রাণ। কত নদীনালা দীঘি সরোবর-

''হেথায় নদীনালা বিলেথালে,
দেশ ঘিরেছে জলে জালে–''

কত কূয়া-কুঁই, পুকুর-পোখরি, তড়াগ-তালাঁও, গাড়া-গাড়িয়া, সায়র-সাগর, দীঘি-সরোবর। তাদের কত রকম নাম— লালবাঁধ, রানীসাগর, খোঁচাকাঁদর, মণিকাঁদর, গোলদীঘি, ধলদীঘি, কাজলাকুঁড়, মধুমুরালী, মতিঝিল, পাত্রসায়র, পাগলাঝোরা, শাঁখারিপুকুর, বানপুকুর, খাটপুকুর, কালীদহ, বুড়াবুড়িদহ, পোয়াতিবিল— আর তাদের নিয়েই কত কথা, কত ইতিহাস, কত রূপকথা, কত চুপকথা!

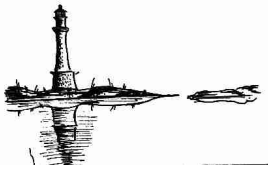

কখনো হঠাৎ হঠাৎ উড়ে যায় সানবাঁধানো পুকুরের ঘাট। পুকুরের জলে হাত ডোবালে আঁজলায় উঠে আসে জল নয় নুড়িপাথর। কোনো পুকুরে পিতলের ঘটি ডোবালেই হয়ে যায় সোনা। ডোবার জলে মরা মাছের চ্যাঙাড়ি চোবালে মরা শোল জীবন ফিরে পায়। দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে শাঁখা পরা হাত দেখতে চাইলে জলের মাঝখান থেকে ঝপ্ করে উঠে আসে দুটি শাঁখা পরা হাত। কখনো সখনো ঘাটের ধারে চারাপোনার মতো ভেসে বেড়ায় মোহর ভরতি শিকলিবাঁধা জোড়া কলসি। অভাবী মেয়ের বাপ পান-সুপারি দিয়ে মানত করলে দীঘির জল থেকে উঠে আসে যৌতুকের সোনাদানা, থরে থরে বাসনপত্র বারকোষ রাঁধবার হাঁড়ি কড়া। রানীর টপা টপা চোখের জলে কোথাও বা গড়ে ওঠে রানীসাগর। আর কোথাও রানীর পূজা পেয়ে জলাশয়ে অঝোরঝর জল উঠলেও রানীকে জলে ডুবে মরতে হয়।

পীরপুকুরে ফুল ভাসিয়ে সেই ফুলটাই ধরতে এখনও এক বুক জলে দাঁড়িয়ে থাকে কত যে বউ হি-হি শীতের রাতে। আবার পোয়াতি বিলে তিন ডুব দিয়েই চাঁদের টুকরো ছেলে পেয়ে যায় মা কত সহজে।

এসব দেখতে জানতে চাও যদি ত চলো জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে।

রানীসাগর

নারায়ণগড়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। খড়গপুর থেকে আর কতটাই বা দূর! বড়জোর কুড়ি কিলোমিটার। খড়গপুর-কাঁথি পিচের সড়ক। বাসেও যাওয়া যায়, ট্রেনেও যাওয়া যায়। এখানে আছে রানীসাগর। রানীসাগর, রানীসাগর। রানীর টপা টপা চোখের জলে গড়া সাগর প্রায় দুশো বিঘা জমির উপর। শুধু কী রানীসাগর— আছে ইন্দ্রানী দীঘি, রনরাজদীঘি।

কোথায় বর্ধমানের দিকনগর গ্রাম আর কোথায় মেদিনীপুরের নারায়ণগড়। দিকনগরের এক পথিক চলেছেন পুরী। তীর্থ দর্শনে। ''এড়ায়ে মেদিনীপুর নারায়ণগড়ে''— চৈতন্যদেবও পুরী গিয়েছিলেন এ পথ ধরেই। দাঁতন, সোনাকানিয়া হয়ে সুবর্ণরখা নদী পেরিয়ে। পায়ে হেঁটে। একদিনের ত পথ নয়। পথের ধারে দিনের শেষে কাটাতে হয় রাত। চটিতে, যাত্রীনিবাসে।

ভদ্রকালী বনের ধারে এমনি এক দিনের শেষে তীর্থযাত্রী পথিক রাত কাটানোর জন্য আশ্রয় নিলেন এক যাত্রী নিবাসে। পথিকের নাম

গন্ধর্ব পাল। তিনি জাতে সদ্‌গোপ। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুমের ভিতরেই দেখলেন- তিন তিনটে আলো! মশালের মতো। ধীরে ধীরে এসে তার মাথার কাছে দপ্ করে নিভে গেল।

আলো ত নয়— তিনজন দেবী। ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী আর রুদ্রানী। দেবীরা বললেন, ''আমরা বহুদিন পড়ে আছি এখানে। তুমি আমাদের এখানেই 'থাপনা' কর। চলেছ তীর্থ দর্শনে, যাও। সাথে করে নিয়ে যাও এই ওষুধটা। কাজে লাগবে।''

পরের দিন ঘুম ভাঙতেই গন্ধর্ব দেখলেন, তাঁর মাথার কাছে তিন-তিনটে পাথর আর একটা শিকড়। পাথর তিনটে ভদ্রকালীর বনে লুকিয়ে রেখে দৈব শিকড়টা হাতে নিয়ে পুরী চললেন। পুরীর রাজবাড়ীতে তখন শোকের ছায়া। রানী গর্ভবতী অথচ প্রসব হল না। ব্যাথায় কুঁকড়ে আছেন। এক আধদিন নয় আট-আট দিন ! রাজা ঘোষণা করেছেন রানীর ব্যাথা কমিয়ে যে প্রসব করাতে পারবে, তাকে দেবেন অর্ধেক রাজত্ব। শোনামাত্র গন্ধর্ব দেবী ব্রহ্মাণীর দেওয়া ওষুধ নিয়ে রাজবাড়িতে ঢুকলেন আর রানীকে প্রসব করিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন। রাজা খুশি হয়ে তাঁকে দিলেন মেদিনীপুরের ভার - নারায়নগড়, কেশিয়াড়ী নিয়ে মোট আট-আটটা পরগনা। তখন কী আর নাম ছিল নারায়নগড় ? নারায়ণগড় নাম ত হল রাজা গর্ন্ধবের মৃত্যুর পর। তাঁর ছেলে নারায়ণের নামানুসারে।

নারায়ণগড়ে ফিরে গন্ধর্ব রাজবাড়ি বানালেন। ভদ্রকালীর বন থেকে পাথর এনে গড়ে তুললেন ব্রহ্মাণীর দেউল। মাঝে ব্রহ্মাণী, দু'ধারে ইন্দ্রানী আর রুদ্রানী। দেবী 'থাপনা'র দিন যে ঘিয়ের প্রদীপ দিয়ে আরতি হয়েছিল দেবীর, তা নাকি জ্বলেছিল এক নাগাড়ে ছ'শো বছর ! শুধু কী এই ? নারায়ণগড়ের রাজবংশ যে-সে রাজবংশ ত নয়। শাহাজাদা খুররম তখনও শাজাহান হননি। পিতার বিদ্রোহী হয়ে পালিয়ে যাবার পথ খুঁজছেন দাক্ষিণাত্যে। এসে পড়েছেন নারায়ণগড়ে। আর পথ নেই। সামনে অঝোরঝর বন। একরাতেই বন কেটে পথ করে দিয়েছিলেন নারায়ণগড়ের রাজা শ্যাম। খুশি হয়ে শাজাহান নারায়ণগড়ের রাজাকে দিয়েছিলেন হাতের পাঁচ আঙুলের ছাপ আর উপাধি 'মাড়-ই-সুলতান'। 'মাড়-ই-সুলতান' — পথের রাজা, পথের রাজা।

সে যা হোক, দেবী ব্রহ্মাণীর কৃপায় রানী মধুমঞ্জরীকে নিয়ে সুখেই ছিলেন রাজা গন্ধর্ব পাল। এদিক দিয়ে পুরী যেতে হলে, যেতে হয় 'যম দুযার' পেরিয়ে প্রণামী দিয়ে 'ব্রহ্মাণী দেবীর ছাপ' নিয়ে। আর তাতে বাড়ছিল রাজকোষাগারের আয়।

রানী মধুমঞ্জরীর মনেও কোনো দুঃখ ছিল না। দেবী ব্রহ্মাণী যার সহায় তার আবার দুঃখ কী ? মুখে সদা সর্বদা হাসি। দাসদাসীদের সাথে সদা সর্বদাই কী মধুর ব্যবহার ! মধু তো মধুই। তাঁকে কেউ কোনোদিন কাঁদতে দেখেনি। ঘুমের ঘোরেও তিনি কোনোদিন কঁকিয়ে কেঁদে ওঠেননি। রাজাও রানীর হাসিমাখা মুখ দেখে বিভোর। -এই ত রানী হাসিমাখা মুখ নিয়ে পুজো দিতে গেলেন ব্রহ্মাণীর দেউলে। ওই ত রানী হাসতে হাসতে সখীদের সাথে পূজোর ফুল তুলছেন। ফোটা ফুলের মতো সারাক্ষণই ত হাসিতে ফুটে আছেন সদানন্দময়ী রানী মধুমঞ্জরী। মধুমঞ্জরী, মধুমঞ্জরী।

দিন যায়। তবে সব দিন ত আর সমান যায় না। নারায়ণগড়ের রাজবাড়িতে ভয়ের দিন, ভাবনার দিন শুরু হল। একদিন রাতে ঘুমের ভিতর রানীকে দেখা দিলেন ব্রহ্মাণী। বললেন, ''পিপাসায় বড় কাতর আমি। জল দে!'' ''জল দে'' ''জল দে'' পিপাসায় কাতর ডাকটা যেন সমগ্র রাজবাড়ির অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়ল। ভয় পেয়ে ঘুম থেকে আঁতকে উঠলেন রানী। এ কী শুনলেন তিনি ! দেবী জল চাইছেন — তার মানে ত — রানী আর্জি

জানালেন রাজার কাছে — যে করেই হোক একটা সরোবর চাই। আর তা আজকের মধ্যেই। কথা মতো ব্রহ্মাণী দেউলের সামনেই খোঁড়া হল সুবিশাল দীঘি। দীঘি বলে দীঘি - আয়নার মতো তার টল টলে জল। সে-জলে ছায়া পড়ে ব্রহ্মাণী দেবীদেউলের। যেন পিপাসায় কাতর ব্রহ্মাণী মা দীঘির হিমশীতল জলে গা ডুবিয়ে বসে আছেন। পিপাসা মিটে গেছে তাঁর। রানী খুশি, রাজাও খুশি। রাজপুরোহিত, কোটাল, সেনাপতিদের মুখেও হাসি আর ধরে না। তবে সে আর কতক্ষণ ! রাত পোহাতে না পোহাতেই রানী সভয়ে রাজাকে জানালেন, ''আজও মা এসে শিয়রে দাঁড়িয়ে বললেন, পিপাসায় বড় কাতর আমি। জল দে !'' জল জল। এত জলেও পিপাসা মিটল না দেবী ব্রহ্মাণীর! সত্যি সত্যি রাজা এবার প্রমাদ গুনলেন। দেবীর পিপাসা যদি নাই মেটে তবে ত রাজ্যের সমূহ বিপদ। ভেবে ভেবে রাজা দিশাহারা।

রাজপুরোহিত তাঁকে অভয় দেন - ''হতাশ হবেন না রাজা। উপায় একটা কিছু হবেই - এই তো 'ভাস' খড়ি পেতে বসেছে।'' বহুক্ষণ খড়ি দেখলেন 'ভাস'। গণকঠাকুর। কপাল কুঁচকে গেল তাঁর। মাথার ঘাম পায়ে ফেললেন। তবু বলতে পারলেন না— কী করে দেবীর পিপাসা মিটবে। পুঁথিপত্র বগলদাবা করে হতাশ হয়ে উঠে গেলেন তিনি। আর সে রাতেই ঘুমের ভিতর রাজপুরোহিতকে দেখা দিয়ে দেবী বললেন, ''রানী মধুমঞ্জরীর চোখের জল চাই। তবে আমার পিপাসা মিটবে।''

''মা চিরসুখী রানী যে কখনো কাঁদেন না ?''

''তাকে কাঁদতে হবে। তার চোখের জল যেখানে পড়বে সেখানেই খুঁড়তে হবে দীঘি।''

''তাই হবে মা, তাই হবে।''

ঘুমভাঙা মাত্রই কুলগুরু দৌড়ুলেন রাজার কাছে। রাজা অবাক, ''রানী মধুমঞ্জরীর চোখের জল ? তাও জোর করে নয়, হতে হবে আপনা-আপনি ? হৃদয় থেকে ?''

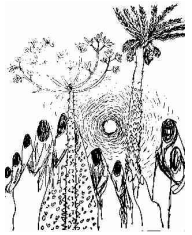

শুরু হল নারায়ণগড় রাজবাড়ীতে চোখের জলের প্রতীক্ষা। রানী কখন কাঁদবেন। রানী নিজেও জানেন না - তাকে অঝোরঝর কাঁদতে হবে। তার চোখের জল মাটিতে না পড়লে দেবী ব্রহ্মাণীর পিপাসা মিটবে না। সারা রাজবাড়িতে ফিসফাস। কানাকানি। রাজা তাকিয়ে থাকেন রানীর চোখের দিকে। ভিতর মহলে সখীরাও উঁকি মেরে দেখে - বিরলে বসেও রানী কাঁদেন কী না। চিরসুখী রানীর চোখের জল কী অতই সহজ ! প্রেমেও কখনো আঘাত পান না। সেবায়ও কোনোদিন ত্রুটি হয় না। অসুখ বিসুখ হয় না। মাথা ধরে না। পায়ে কোনোদিন কাঁটাও ফুটে না। কী করে শুধুশুধু কেঁদে ভাসাবেন ?

রাজার ভাবনা বাড়ে। রাজপুরোহিত আকুল হয়ে খোঁজাখুঁজি করেন। দাসীদের জনে জনে ডেকে পাঠান - ''তোরা এত কাছাকাছি থাকিস, রানীমাকে কাঁদতে একবারও দেখিস নি ?''

''না গো ঠাকুরমশাই, রানীমা তো সবসময়ই হাসেন।''

''এবার থেকে ভালো করে খেয়াল রাখিস - চোখ থেকে একটসা জলও যদি পড়ে-''

রানী মধুমঞ্জরী জানেন না তার চোখের জল নিয়ে এদিকে এত সাধ্যসাধনা! দিন যায়, মাস যায়। রাজার বাগানে মরসুমী ফুল ফোটে। ফুল আবার ঝরেও যায়। সখীদের সাথে নিয়ে ফুল তোলেন রানী। সে-ফুল দেবীর চরণে রেখে আসেন। দিন শেষ হয়, রাত আসে। রাত শেষ হয়, আবার দিন। তবু রানী মধুমঞ্জরীর চোখে জল আসে না। দেবী

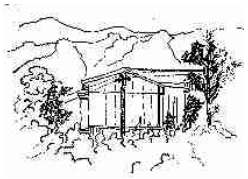

ব্রহ্মাণীর পিপাসাও মিটে না। রাজার ভাবনাও দূর হয় না। ভেবে ভেবে রাজপুরোহিতেরও ঘুম আসে না।— এ কেমন রাজমহিষী যিনি কাঁদতেও জানেন না ?

যা হোক নারায়ণগড়ে সেবার খুব খরা হল। খরা বলে খরা ! দীঘি-সায়রের জল ফুরোল। মাঠের ঘাস পুড়ল। গাছের পাত শুকোল। চাষের খেত চৌচির হল। প্রজারা বলল, ''এ হল দেবী ব্রহ্মাণীর রাগের ফল। জল না পেয়ে কুলদেবী রাগ করেছেন।'' রাজবাড়ির ভিতরেও খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। দাসদাসীরা কানাকানি করল। ফিস্‌ফাস্‌ শুনে বাইরে এসে রানী মধুমঞ্জরী বললেন, ''কী হয়েছে ? তোরা কী বলছিস ?''

''কিছু না রানী মা।''

আর এসময় রানী মধুমঞ্জরীর চোখে পড়ল দৃশ্যটা। কালো কালো মানুষ। মেয়েরা, শিশুরাই বেশি। হুড়মুড় করে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে রাজবাড়ির দিকে। হাতে তাদের হাঁড়ি-কলসি, ঘটি-বাটি গাগরা। তাদের গ্রামে ত এক টসা জল নেই। তারা জল নিতে এসেছে রাজবাড়ির ভিতরের ইঁদারা থেকে। কারোর পরনে ছেঁড়া কানি। কারোর বা তাও নেই। জরাজীর্ণ শরীর। পিপাসায় ধুঁকছে। রানী বললেন, ''চল্‌ ত দেখি''

সেই বেরিয়ে আসা, রাজবাড়ির সুখের শয্যা থেকে ধূলিশয্যায়। ধূ ধূ মাথা ফাটা রোদ। পায়ের তলায় আগুনের আংরা।

''তোমরা কতদূর থেকে আসছ ?''

''অ-নে-ক দূর - সেই মা মনসা কাশীপুর পাটলী ডহরপুর –''

সব আদিবাসীদের গ্রাম !

দেখতে দেখতে রানী মধুমঞ্জরীর দু'চোখ বেয়ে অঝোর ঝর জল! চোখ থেকে টসা টসা গড়িয়ে পড়ে ভিজিয়ে দিল মাটি। রানীর সেই চোখের জলে ভেজা মাটিতে খোঁড়া হল দীঘি। প্রায় দুশো বিঘা জমির উপর। যার নাম হয়ে গেল রানীসাগর।

রানীসাগর, রানীসাগর।

নারায়ণগড়ে এখনও আছে রানীসাগর। ''নারায়ণগড়ে এখনও কাঁদিছে রানী।''

● — ● — ●

বোকা

বিকাশ রায়

যেদিন খবরটা পেয়েছিল সেদিন থেকেই মনটা আনন্দে ভরে গিয়েছিল। যদিও খবরটা সে সরাসরি পায়নি। একজনের মারফত পেয়েছিল। তার মাধ্যমেই যোগাযোগ হয়েছিল। সেই বলে দিয়েছিল কিভাবে এগোতে হবে। সেইজন্যই তাকে ভীষণ বিশ্বাস করে সমীর। তার কথা মতই সমীর অমল বাবুর বাড়ী গিয়েছিল।

অমল বাবু পাশের পাড়াতেই থাকে। পোষ্ট ম্যানের চাকরী করে। এমনিতে সমীরের নামে তেমন কোন চিঠি পত্র আসে না। কেউ তেমন খোঁজ খবরও রাখে না। বেকার বলে কেউ তেমন গুরুত্বও দেয় না। আত্মীয়স্বজন যারা আছে, তারাও দূরত্ব বজায় রাখে। পাছে কিছু চেয়ে বসে। সমীর তাতে কিছু মনে করে না। সমীর জানে বেকার জীবনের নিজস্ব একটা সঙ্গী আছে। কিছু বিধি নিষেধও আছে। সমীর সেই মতই চলার চেষ্টা করে।

এবারও তাই করছে। অমলবাবুকে নিজের নাম ও বাড়ির ঠিকানাটা ভালোভাবে বলে এসেছে, যাতে কোন চিঠি এলে বাড়ী চিনতে ভুল না হয়। পোষ্ট ম্যান অমল বাবুও সমীরকে আশ্বস্ত করেছে, চিঠি আসার পরের দিনই সে পেয়ে যাবে।

কিন্তু না এক সপ্তাহ কেটে গেছে। সমীর কোন চিঠি পায়নি। অথচ কোলকাতা থেকে খবর এসেছে চিঠি ছাড়া হয়েছে। সমীর কেমন আনমনা হয়ে ওঠে। আরও একবার অমলবাবুর কাছে যায়। না এবারও তার নামে কোনও চিঠি আসেনি। সমীরের মনে আশঙ্কার মেঘ জমতে শুরু করে। সমস্ত কিছুই প্রথম থেকে ভাবতে শুরু করে।

মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা ভালোই দিয়েছিল। সাক্ষাৎকারের দিন সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছিল। তাকে দূরে পাঠানো হলে তার কোন আপত্তি আছে কিনা জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাতেও সমীর কোন আপত্তি করেনি। সমীর নিশ্চিত ছিল এই সুযোগটা সে পাবে। গ্রামের যাকে সে বিশ্বাস করে সেই ব্যক্তিই সমীরের নামে উপর মহলে সুপারিশ করেছিল।

সমীর জানতে পারে সুপারিশের যুগে সুপারিশ ছাড়া বেকারত্ব ঘোচানো একপ্রকার অসম্ভব। সেই সুপারিশের জন্য সমীর বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার আশা করে দৌড়া দৌড়ি করছিল।

তার জন্য সুপারিশ যেহেতু জেলা সদরের বড় নেতার কাছে পৌঁছে ছিল, তাই সমীরের আশাও ক্রমশ তীব্র হচ্ছিল। যতদিন পেরেছিল সমীরের মনও ছটফট করছিল। অসহায় শিক্ষিত বেকারের কাছে সুপারিশই ছিল একমাত্র বেঁচে থাকার আশা।

এইভাবে আরও কয়েকদিন কেটে গেল। সমীর ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ল। নিজের প্রতিই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতে শুরু করে। এত কষ্ট করে পড়াশোনা করে কি লাভ ? চাষ করার মতো জমিও তার নেই যে চাষ করে নিজের জীবন চালিয়ে নেবে। এই রকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সমীর বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে।

''সমীর এদিকে একবার আয়'' পেছন থেকে একজন বয়স্ক মানুষের গলার আওয়াজ পেল। যেহেতু তার নাম ধরেই ডাকা হলো, তাই সমীর পেছন ফিরে তাকাল। গ্রামের বড় ব্যবসায়ী সুশীলবাবু তাকে ঈশারা করে চা দোকানের সামনে ডাকছে। বিরক্ত মন নিয়ে সমীরের যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু বয়স্ক মানুষের ডাককে উপেক্ষাও করতে পারছিল না। সে সুশীল বাবুর কাছে গেল।

''তুই অমল বাবুর কাছে গেছিলি, তোর চিঠি এসেছে কিনা জানতে ?'' সুশীল বাবু সরাসরি সমীরকে জিজ্ঞাসা করল। সমীর কোন উত্তর দিল না চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মনে মনে ভাবতে লাগল সুশীল বাবু কি করে জানল। ''অবাক হচ্ছিস তো ? আমি কি করে জানলাম।'' সুশীল বাবু সমীরকে উদ্দেশ্য করেই বলল, ''আমি জানি সমীর তোর নামেও সুপারিশ জেলা সদরে গেছিল, কিন্তু তোর চিঠি আসেনি।''

কথাগুলো শুনে সমীর আবারও অবাক হলো। কিন্তু মুখ থেকে একটি শব্দও বেরোলো না। ম্লান মুখে সুশীল বাবুর দিকে তাকালো।

সুশীল বাবু হাসি হাসি মুখে আরও বলল 'আমার ছেলেরও সুপারিশ ছিল। ভারী সুপারিশ, আমার ছেলে চিঠি পেয়েছে। গত সপ্তাহে যোগ দিতে গেছে।'

''ধন্যবাদ সুশীল বাবু'' এতক্ষণ পর সমীর মুখ খুলল। ''আমার ভুলটা ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্য।'' কথাটা শুনে সুশীলবাবু অবাক হলেন।

মনের ক্লান্তি ঝেড়ে সমীর হাসি মুখে বলল ''আমি কি বোকা; তাই না ?''

সুশীল বাবু সমীরের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

❁ — ❁ — ❁

আদিম জনজাতি ও বনৌষধি (গাছগাছালি)

ড. শান্তনু পান্ডা

আদিম জনজাতিদের জীবন অতিবাহিত হয় জঙ্গলের উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্য দিয়ে। তারা সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে জঙ্গলে যায়, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর বাড়ি ফেরে। দিনের বেশীর ভাগ সময়টা তারা জঙ্গলে অতিবাহিত করে। জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকা প্রতিটি উপাদান তারা জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে। বাড়ীর আসবাব পত্র, নিত্য নৈমিত্তিক খাদ্য, ওষুধপত্র, ফলমূল তারা সংগ্রহ করে মানুষ-পরিবেশ-ভেষজ উদ্ভিদের সম্পর্ক অটুট রাখে।

আদিম জনজাতি লোধা-শবর-খেড়িয়া-বীরহড় উপজাতিরা এখনও ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার ও উপকারিতা সম্পর্কে খুবই সচেতন। তাদের বিশ্বাস যে গাছের শিকড় বাকড় এখনও কথা বলে— খুব বড়সড় বিপদ না হলে তারা আয়ুর্বেদ চর্চার বাইরে যায় না। তারা প্রকৃতি প্রেমি এবং প্রকৃতি দিয়েছে জন্ম-খাদ্য-বাসস্থান— তাই প্রকৃতির থেকে প্রাপ্ত ভেষজ ঔষধ জীবন দান করবে। যাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা। গাছ পালার পাতা, শিকড়, ছাল, মূল, লতা থেকেই তো তৈরী হয় আয়ুর্বেদ ঔষধ। যার শারীরিক ক্ষতি নেই বললেই চলে। যে কোন রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উপজাতিরা শিকড়/মূলকে প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করে। একটি সমীক্ষার সময় দেখেছি বাঁকুড়া ছাতনা ব্লকের একটি গ্রামে মুন্ডারা মাঘ মাসে প্রথমে / শেষ সপ্তাহে মাঘি পূর্ণিমার দিন বেশ কিছু গাছের মূল, শিকড়, লতা, ফল, পাতা এক সপ্তাহ ধরে সংগ্রহ করে ঐ দিন গ্রামের সবাই একত্রিত হয়ে পূজো করে- ঐ সমস্ত শিকড় বাকড়কে বেটে— মন্ড বানিয়ে সমস্ত মানুষকে খাইয়ে দেওয়া হয় যা রোগ প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে। এবার ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার আদিম জনজাতিদের আয়ুর্বেদ চর্চার কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হল—

নিমপাতা বেটে খেলে রক্ত পরিষ্কার ও অ্যান্টি পক্স হিসাবে কাজ করে। নিম গাছের ছাল বেটে খেলে ঘা, চুলকানি ও খোস পাঁচড়া ভালো করে।

নিম গাছের ছাল রাতে জলে ভিজিয়ে সকালে খালি পেটে খেলে করোনার প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে।

ভেষজ উদ্ভিদ	উপকারিতা
কাঁচা হলুদ–	মানুষ, ছাগল, গরু, মুরগীর হাত, পা, ভাঙলে বা মোচকালে কাঁচা হলুদ বেটে ও চুন মিশিয়ে বেঁধে দিলে উপশম হয়।
তুলসি ও বাসক পাতা–	সর্দি, কাশি হলে বেটে রসটা ৭ দিন খেতে হয়।

চাঁদ্রগদ–	এই গাছ ঘরে থাকলে সাপ আসে না। এর শিকড় বেটে জল মিশিয়ে স্প্রে করলে সাপ গর্ত থেকে ও বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।
পঙ্গা গাছ–	এর লতাটা বেটে খালি পেটে খাওয়ালে— আমাশা ও পেট যন্ত্রণা ভালো হয়।
শতমূল–	এর মূল বেটে খাওয়ালে মেয়েদের মেন্স ঠিকঠাক হয়। মেন্সের সময় পেট যন্ত্রণা ভালো হয়, সাদাস্রাব ভালো হয়।
বকা–	এই গাছের লতা বেটে খাওয়ালে নেশা কাটে - মদের নেশা।
কালমেঘ, তেলাই, নীলাকাঠী, বীড়জাড়ী, গঁদ, দুম্ভি, আটকিরি- এই সব গাছের শিকড়	এই সব গাছের শিকড় বেটে বছরের প্রথমে রোগ প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে।
ঈশ্বরমূল–	এই শিকড় বেটে খেলে শ্বাসকষ্ট উপশম হয়।
আটকিরি গাছ–	শিকড় বেটে খাওয়ালে বমি বন্ধ হয়।
কামরাজ গাছ–	এই গাছের ছাল ও শিকড় বেটে খাওয়ালে জন্ডিস ভালো হয়।
কাঠা গাছের মূল–	বেটে খাওয়ালে পাতলা পায়খানা, বদহজম উপশম হয়।
দুম্ভি গাছের শিকড়–	চল্লিশ বছরের পর যে চাল্‌শা রোগ হয় তার উপশম হয়।
বাঁদগুর্চা শিকড়–	বেটে খাওয়ালে 'ধাতু' রোগ ভালো হয়।

এই সমস্ত জঙ্গলে উৎপাদিত গাছ আদিম জনজাতিদের রোগ উপশমে উপযোগী। তারা এগুলো এখনও ব্যবহার করে। ডাক্তারখানা যায় না।

❁ — ❁ — ❁

উপলব্ধি

হরিশঙ্কর দে

ঘুম থেকে উঠে হাতে ব্রাশ নিয়ে পাড়া বেড়ানো মুকুলের স্বভাব। যে কোনো ঋতুতে, শীত হোক বা গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষা। তবে এখন শীতকাল। চাদরে মুড়ি দিয়ে হাতে ব্রাশ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। হঠাৎ একদিন পাড়া বেড়িয়ে ফিরছে।, বাড়ির সামনা সামনি এসে দেখে কিছু লোক জটলা পাকিয়েছে। মুকুলের মা বলে— ''বাবু জানিস আজ আমাদের খামারের কুকুরগুলা সব মরে গেছে।'' শুনে অবাক হয়ে যায় মুকুল, বলে— কিভাবে ? কি করে ! মা বলে ''কেউ মনে হয় বিষ দিয়েছে খাবারের সঙ্গে কাল রাতে।'' মুকুল তৎক্ষণাৎ গিয়ে দেখে সত্যিই খামারে পড়ে আছে দুটো বাচ্চা মৃত–কুকুর; মা-কুকুরটি নাকি পাশের বাড়ির গলিতে মরে পড়ে ছিল; কোন ব্যক্তি তাকে ফেলে দিয়ে এসেছে মাঠে। আসলে মুকুল পাড়া বেড়িয়ে এসে, চা খেয়ে যেত কুকুর গুলোকে দেখতে এবং খাবার দিতে, কেননা কুকুরগুলো মুকুলদের খামারেই থাকত। খড়ের গাদায়। তবে এই আজকের ঘটনা অর্থাৎ যে ঘটনাটি আজ ঘটে গেছে তা বড়ই বেদনা দায়ক, দুঃখ জনক চোখও অস্বস্তি অনুভব করে। একটি বাচ্চা কুকুর যার পেছনের একটি পা খোঁড়া সে বেঁচে আছে, আর দুটো পড়ে থাকা নিথর বাচ্চা কুকুরের কাছে গিয়ে

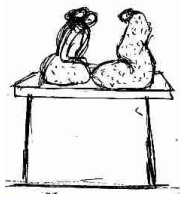

একবার একটি উপর আর একবার অন্যটির উপর গিয়ে শুয়ে পড়ছে। হয়তো তখনও কুকুরটি অনুভব করতে পারেনি যে তার ভাইবোনেরা মৃত। মনে ওঠে রুদ্ধশ্বাস - ''সব ঘোঁচে তবু ভ্রান্তি ঘোঁচে না।''

এরপর থেকে মুকুল প্রতিনিয়ত সেই খোঁড়া বাচ্চা কুকুরটির খোঁজ নেয়— খাবার দেয়। একটা মোটা কাগজের বক্স জোগাড় করে ঘর বানিয়ে দেয়। একটু একটু করে বড় হতে থাকে কুকুরটি। কারো লাথি, কারো ঝাঁটা ও কারো কারো ভালোবাসা নিয়ে। হঠাৎ করেই একদিন গালি গালাজ শুনতে হয় মুকুলকে পাশের বাড়ির বৌদির থেকে কারণ কুকুরটি নাকি মুকুলের কাছে খায় আর বৌদির জায়গায় পায়খানা করে। মুকুল বলে— ''আহা বৌদি বাচ্চা কুকুর একটু বড় হয়ে যাক দূরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসবো, আর তোমরা তো দুপুরের অনেক উচ্ছিষ্ট খাবার ফেলে দাও, সেটা ওকে দিও। একদিন দিও দেখবে আর পায়খানা করবে না।''

বৌদি ঝাঁঝিয়ে বলে— ''না না, তোর কথা বাদ দে তো, প্রতিদিন ডুব দিতে পারবো নি।''

চুপ করে ফিরে আসে মুকুল। কুকুর প্রভুভক্ত প্রাণী, দুনিয়ায় এই একটা প্রাণীই তো এখনো বেঁচে আছে যে তার প্রভুর জন্য প্রাণও দিতে পারে। এমনি করেই দিন কেটে যাচ্ছে। কুকুরও বড় হচ্ছে। আবার হঠাৎ একদিন কুকুরটি রাস্তার উপর চলে আসে— ব্যাস রাস্তা হাটতে জানে না, মা-মরা, আপটু অবলা প্রাণী। এক গাড়ি ধাক্কা দিয়ে যায়, যদিও খোঁড়া পা ততদিনে ভালো হয়ে গিয়েছিল প্রাকৃতিক নিয়মে। সেদিন পিছনের অন্য ভালো পা-টি আবার খোঁড়া হয়। মুকুল তাকে যথারীতি সুস্থ করে তোলে পুনরায়। কিন্তু মুকুল লক্ষ্য করে যে ইদানিং সে যদি কোনো কাজে বাইরে যায় তো কুকুরের আর খাবার জোটে না, অন্য এক বৌদি মাঝে মাঝে ইচ্ছে হলে খাবার দেয়। তবেই বেঁচে আছে। একদিন বৃষ্টি হচ্ছে বাড়ির দরজা জানালা মোটামুটি বন্ধ সবার। শীতকালের বৃষ্টি কিনা। তবে কুকুরটি না বুঝেই এক অন্যায় করে বসে। যার কারণে তার প্রভু মুকুলকে আবার গালি গালাজ শুনতে হয় বিস্তর। পাশের বাড়ির বা অন্য লোক কটু কথা বললেও গায়ে মেখে নেওয়া যায়, কিন্তু যদি নিজের আত্মীয় হয়, যদি নিজের বাড়ির লোক হয় তবে। যারা ব্যাপারটা সম্বন্ধে অবগত। কুকুরটির অন্যায় সেই বৃষ্টিমুখর শীতল রাত্রে কোনো এক সময়ে সে স্থান করে নেয় মুকুলের জেঠিমার বাড়ির এক দরজার কোণার পাপোসের উপর। ঠান্ডার রাত্রে সবাই গরম চায়। পরের দিন সকালে উঠেই মুকুলকে শুনতে হয় বিভিন্ন ধরনের কথা। মুকুলের মা-ও বিরক্ত হয়ে ওঠে।

মুকুল কোনো কথা না বলে ব্রাশ হাতে পাড়া বেড়াতে যায়। ফিরে এসে একটি থলে নেয়, কুকুরের কাছে যায়, কুকুরটি লেজ নাড়তে নাড়তে প্রভুর দিকে ছুটে আসে। মুখের সামনে থলি ধরতেই সেখানে প্রবেশ করে কুকুরটি, আনন্দে। সাথে নেয় দুটো বিস্কুটের প্যাকেট। শেষ খাবার। ছেড়ে দিয়ে আসে জঙ্গলের কাছাকাছি, যদিও একটি আদিবাসী সাঁওতাল পাড়া রয়েছে সেখানে। শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছে কিছু লোক। সাথে কুকুরও রয়েছে। তা দেখে কিছু স্বস্তি অনুভব করে মুকুল। গভীর বিষাদ নিয়ে ফিরে আসতে আসতে মুকুল ভাবে— একাকী বাঁচতে জানা প্রয়োজন। যদি মারা যায় তবে কুকুরের জীবন শেষ, যদি বেঁচে থাকে তবে যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রতিযোগিতা, লড়াই

করে বেঁচে থাকার আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবে।

❁ – ❁ – ❁

ভগবানবাবু

দেবাশীষ সরখেল

বেটে লোকটাকে সব বিয়েবাড়ি ভোজবাড়িতে দেখছি।
চেয়ারম্যান ক্যামেরাম্যান ডেকোরেটর ইত্যাদি হলে তবুও কথা ছিল।
তাহলে তো চিনতামই। সে সব কিছু না। আয়োজনের থেকে একটু দূরে চেয়ার নিয়ে বসে থাকে। চা-কফি অবধি খায় না।
কৌতুহল বাড়তে লাগলো। পরপর পাঁচ খানা কাজের বাড়িতে দেখার পর ওকে ফলো করতে লাগলাম।
দেখি প্রায় খাওয়া-দাওয়া চুকে যাওয়ার পর, সে কিচ্ছুটি না খেয়ে কিচেন থেকে উদ্বৃত্ত খাবার থলিতে ভরে অন্ধকারে নিরুদ্দেশ।
আমিও পিছন পিছন স্কুটি চালালাম। রেলস্টেশনের থেকে একটু দূরে আলো -আঁধারির মধ্যে যেতেই যত ভবঘুরে পাগল ও উন্মাদ ওকে চেপে ধরল।
কারো হাতে এনামেলের বাটি কারো হাতে শাল পাতা। কয়েক মিনিটের মধ্যে খাবার ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়ে অন্ধকারে হাওয়া।
স্কুটি থামিয়ে চুপচাপ দাঁড়ালাম।
হঠাৎ পাশে এক ভিখারি গোছের লোক। দাঁত বের করে হাসছে।
বলে— কাকে খুঁজছেন ভগবানবাবুকে ? আর পাবেন না।
—ওকে পেতে গেলে আরেকটা ভোজবাড়ি অবধি ওয়েট করত হবে।

❁ – ❁ – ❁

আদিবাসী নৃত্যসংস্কৃতি

সৌমেন মণ্ডল

রাষ্ট্রসংঘের একটি বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে : তারাই হল দেশজ আদিবাসী যারা বর্তমানে সেইসব লোকেদের বংশধর, যারা সেই সময়ে সেই দেশের ভূ-খণ্ডে সামগ্রিকভাবে বা আংশিকভাবে বসবাস করত। যখন অন্য কোনও সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের লোকেরা পৃথিবীর অন্য দেশ থেকে সেই দেশে এসে উপস্থিত হয়েছিল এবং যুদ্ধে পরাজিত স্থানীয় মানুষেরা অপ্রধান শেণি হিসেবে ঔপনিবেশিক পরাধীন অবস্থায় বাস করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তারা এখনো নিজেদের বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি ও ভাবধারাকে মেনে চলে। বর্তমানে যে রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে তারা বসবাস করছে, সেখানে প্রভুত্বকারী গোষ্ঠীগুলির জাতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। (E/CN. 4/Sub 2/L.566.P.10)

সাঁওতালী ভাষা হল পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যে ব্যবহৃত দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা। সাঁওতালরা নিজেদের অরণ্যের অধিবাসী বলে মনে করেন। তারা মনে করেন জঙ্গলের

অধিকার কেবল তাদেরই। তাদের সংস্কৃতিকে যেভাবে তারা আগলে রেখেছেন এবং বংশপরম্পরায় সঞ্চালিত করে চলেছেন তা ভারতীয় সংস্কৃতিতে এক অনন্য নজির গড়ে তুলেছে। প্রতিটি উৎসব ও অনুষ্ঠানে তাদের সংস্কৃতির প্রাণ সঞ্চারিত হয় তাদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে।

নাচ গান ও সুরের মূর্চ্ছনা প্রতিটি সাঁওতাল মানব মানবীর রক্তের গভীরে নিহিত। জন্মের পর থেকেই তারা যেন তাদের নাচ-গান ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি পালনে বদ্ধপরিকর। উৎসব, পরবে নাচগান ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে কাজের ফাঁকে একঘেয়েমী দূর করার জন্যও তাদের কন্ঠে জেগে উঠে সুর। পথে যেতে যেতে, জঙ্গল থেকে বনজ সম্পদ মাথায় বয়ে নিয়ে আসতে আসতে, মেলায় বা অনুষ্ঠানে যোগদান করতে যাওয়ার পথে সাঁওতাল রমনীদের কণ্ঠে গান ভেসে আসে। অর্থাৎ ক্লান্তি ও একঘেয়েমী দূর করার জন্য সাঁওতাল পুরুষ ও নারীরা তাদের জীবনের গান গেয়ে চলেন। পাহাড়ের কোলে কোনও গ্রামে যদি ধামসা-মাদলের দ্রিম দ্রিম বাজনা শুনতে পায়, আদিবাসী রমণীর মনের ভেতর ঝড় ওঠে ঐ ছন্দে পা মেলানোর। হাতে হাত ধরে তারা আনন্দে নেচে ওঠে। এই নাচ-গানের নেশা তাদের জীবনে ওতপ্রতভাবে জড়িত। সারা রাত ধরে চলে নাচ গান। জীবনের সকল হাতাশা দূরে সরে যায়। বাস্তব জীবনের অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট তাদের স্পর্শ করতে পারে না। মহুয়ার গন্ধে মাতাল হয়ে জীবনের আনন্দ যজ্ঞে সামিল হয় সাঁওতাল পুরুষ ও নারীরা। অভাব আছে, কিন্তু ভালোবাসা ও আনন্দের অভাব নেই।

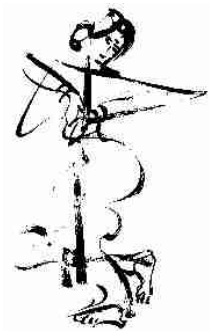

সাঁওতালী উৎসবে নাচগানের জন্য বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ধামসা, মাদল, ঘন্টা, বাঁশি, কেঁদরী, ব্যাগড়া। সারা বছর ধরে সাঁওতালরা তাদের দৈনন্দিন জীবন, সংস্কৃতি, বিবাহ, পূজো, উৎসবে তাদের নাচগানের মধ্যে জীবনকে উপভোগ করেন। সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে আনন্দ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সকলেই। প্রকৃতির মধ্য থেকেই তারা তাদের সাজ সজ্জার উপাদানগুলোকে খুঁজে নেন। পুরুষরা মাথায় লাল-নীল-সবুজ কাপড়ের ফেট্টি বাঁধেন, তার মধ্যে গুঁজে নেন ময়ূরের পেখমের পালক। তেমনি সাঁওতাল রমণীরাও মাথার খোঁপায় গুঁজে নেন নানা রকম ফুল, কানের দুল, হাতের বালা ইত্যাদি। এসব তারা সংগ্রহ করেন প্রকৃতি থেকেই। বৃক্ষরাজি তথা শাল-মহুল গাছের সাথেও তাদের জীবনের আত্মিক সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। শালগাছের নিচেই তাদের যাবতীয় পরব-উৎসব, মারাং-বুরু কিম্বা জাহের এরার থান কিংবা কোনও নাচ গানের আসর। শাল গাছে শাল ফুল ধরলে ঠিক হয় বাহা পরবের দিন। প্রকৃতির ফুল, ফল ও বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করার আগে বনদেবীকে উপাসনা করার প্রথা সাঁওতাল সমাজে 'বাহা' উৎসব নামে পরিচিত।

প্রকৃতির উপাসক আদিবাসীরা বসন্তের প্রাক্কালে তাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব পালন করে থাকেন।

আদিম মানুষ যখন যাযাবর জীবন যাপন করত, তখন তারা নানাভাবে মনে ভাব প্রকাশ করত। নির্দিষ্ট কোনও ভাষা ছিল না। নানারকম অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত। ধীরে ধীরে তাই নৃত্যের রূপ ধারণ করেছে।

আগেকার দিনে বন্যমানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোকে কোনও অশুভশক্তির প্রভাব বলে মনে করত। এগুলো থেকে নিজেদের রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা নাচের মাধ্যমে তাদের

আরাধ্য দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করত। হ্যারিসন বলেছেন— ''When a savage wants sun or wind or rain he does not go to chruch and prostrate himself before a false God. He summons his tribe and dance a sun dance or wind-dance or rain dance.'' ক্রুকের ভাষায়— ''In all rites dancing as a means of scaring the demon of evil holds an important place.''

লোকনৃত্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক ড. সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেছেন— ''ধ্রুপদী বা শাস্ত্রীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ শিক্ষা, দেহ-ভঙ্গিমার নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ প্রয়োজন। অন্যদিকে লোকনৃত্যের বেলায় এ জাতীয় আয়াসসাধ্য শিক্ষা দরকার হয় না। তবে যথেচ্ছভাবে হাত-পা নাড়লেই লোকনৃত্য হয় না। এখানে শিল্পীরা নেচে নেচেই শিক্ষা লাভ করে। যুথবদ্ধতা লোক নৃত্যের অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। স্বতস্ফূর্ত, সহজ, সাবলীল গোষ্ঠী চেতনার দ্যোতক রূপে লোকনৃত্যকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।'' এই প্রসঙ্গে প্রসাদ রায় বলেন, ''লোকনৃত্যের জন্য কৃত্রিম মাচা বাঁধতে, আলো জ্বালতে বা পট ঝোলাতে হয় না। শিল্পীদের পায়ের তলায় থাকে অনাদৃত শ্যামলভূমি, মাথার উপর থাকে অসীম আকাশের নীলিমা। শিল্পী হয় তো সেখানে নিজেদের শিল্পী বলেই জানে না। শুকনো ব্যাকরণের বাঁধা-বচনও তাদের অজানা। নাচে তারা অচলায়তন থেকে মুক্ত প্রবল জীবনের আনন্দে এবং অঙ্গভঙ্গে, ছন্দে ছন্দে প্রকাশ করে সরল প্রাণের আশা আকাঙ্ক্ষাই। যে কোনও জাতির সত্যিকারের আত্মা খুঁজে পাওয়া যায় তার লোকনৃত্যে।''

আদিবাসীদের বিশ্বাস নৃত্যের তাল এবং গানের সুরে আছে অতিমাত্রায় সারবস্তু এবং ম্যাজিক বা ঐন্দ্রজালিক শক্তি। জীবন ধারণের সকল ক্ষেত্রে এ শক্তি প্রয়োগ করতে পারলেই তাদের মঙ্গল অনিবার্য। এ কারণেই আদিবাসীদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকটি পূজা-পার্বণ, ব্রত-অনুষ্ঠানে রয়েছে নৃত্য ও গীতের ব্যবহার।

লাঙড়ে :

সাঁওতালদের অবসর বিনোদনের প্রধান নাচ হল লাঙড়ে নাচ। সাঁওতালি জগতের স্বনামধন্য নাট্যকার এবং বেতার শিল্পী চন্দ্রনাথ মুরমুর মতে— 'লাঙা এড়ে'— এই দুটি শব্দ যোগ করে 'লাঙড়ে' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। সাঁওতালি ভাষায় 'লাঙড়ে' অর্থে 'ক্লান্তি' আর 'এড়ে' অর্থে দূর করা। সারাদিন পরিশ্রমের শেষে ক্লান্তি দূর করার জন্য যে নাচ তাহাই লাঙড়ে। এই নাচের নির্দিষ্ট কোন ঋতু নেই। যে কোনও সময় কালেই এই নাচ করা যায়। লাঙড়েতে আছে সৃষ্টি তত্ত্বের গান। যেমন—

সনা থৌরি সানা থৌরি
হর'মা দেয়ারে মিরতিকা জানামেন
এ প্রভু এ গঁসায় সনা থারি

— অর্থাৎ সোনার থালা, সোনার থালা, প্রভুগো সোনার থালা। কচ্ছপের পিঠের উপর মাটির সৃষ্টি হল, ও প্রভু, ও গোঁসাই সোনার থালা।

এই লাঙড়ে নাচ ও গানের মধ্যে সাঁওতাল আদিবাসীরা অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেন। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর শুরু হয়ে ভোর রাত পর্যন্ত এই নাচ মূলতঃ গ্রামের মাঝি বা মোড়লের আঙিনাতে অনুষ্ঠিত হয়। কুমারী মেয়েরা সন্ধ্যার সময় জল এনে গোবর দিয়ে নাতা দেয়। গ্রামের যিনি মোড়ল থাকেন তিনি ঐ স্থানে সিঁদুরের টিকা দেন। তারপর গোপী-

কানাই (রাধা-কৃষ্ণ)-এর নাম স্মরণ করে তারা গান আরম্ভ করেন। এই গানের একটি আলাদা বাজনা আছে। এই বাজনায় গোটা এলাকার আদিবাসীদের একটা মিল রয়েছে। অনুষ্ঠান চলাকালীন যুবক-যুবতীদের দেখভালের দায়িত্বে থাকেন গ্রামের আর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি জগমাঝি। অতীত দিনে সাঁওতালদের বিভিন্ন জায়গায় বসবাসের কথা, লড়াই-সংগ্রামের কথা যেমন এই গানে গীত হয়, তেমনি জীবনে চলার পথে নিজেদের সুখ দুঃখের কথাও উচ্চারিত হয় লাঙড়ে গানে। যেমন—

''অকারেদ ঢাক সাডে - অকারেদ রাহাড় সাডে
লে লিপুর ঝুমকা সাডে কান
হানার হঁঞাহার সাড়িম চেতান
চট্ খনিঞ কয়ঃ লেৎ
আয় বাবা আতুরে ঢাক সাডে রাহাড় সাডে
লে লিপুর ঝুমকা সাডে কান।
এ জুরি ফেলা জারি ইদি কাঞমে সেটের কাঞমে
আয়ো বাবা আতুরে ঢাক সাডে ঝুমকা সাডে
লে লিপুর ঝুমকা সাডে কান।''

— অর্থাৎ কোথায় যেন ঢাক, রাহাড়, ঝুমকা বাজে ঐ। শ্বশুরবাড়ির ছাউনি থেকে চেয়ে দেখলাম মা বাবার গ্রামে ঢাক রাহাড় ঝুমকা বাজে।

সারা বছর ধরে ক্লান্তি দূর করার জন্য এইভাবেই সাঁওতাল আদিবাসীরা এই নাচগানে মেতে থাকেন। যুবতী মেয়েরা গান গায় রঙীন শাড়ী পরে আখড়ায় নাচ করে। যুবকরা বাদ্যযন্ত্র বাজায়। (অবশ্য বর্তমানে যুবক যুবতী সকলেই এই নাচে অংশ গ্রহণ করে।) এই লাঙড়ে নাচ-এ যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলি হল— তুমদাঃ (খোল), মাদল, ধামসা, বাঁশি, কেঁদরী, ঝুমকা ইত্যাদি। আদিবাসীরা মনে করেন ঐ নাচ নাচতে তাদের নাচের আখড়ায় আরাধ্য দেবতা নেমে আসেন। ধবধবে সাদা কাপড়ে পরে মেয়েদের হাত ধরে তিনিও নাচ করেন। আবার কিছুক্ষণ পরেই উধাও হয়ে যান। নাচ-গানের মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বয়স্কদের কাছ থেকে এই ধরনের কথা শোনা যায়।

বছরের বিভিন্ন সময় বাঁধনা... লাঙড়ে নাচ হয়। অনাবৃষ্টির ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও এই নাচ নাচা হয়। বৃষ্টির দেবতাকে আহ্বান করা হয়।

● — ● — ●

ঝুমুর সম্রাট বিজয় মাহাত

প্রিয়ব্রত গোস্বামী

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা জাম্বনি থানার চিঁচিড়া ডাক বিভাগের অন্তর্গত কাঁদোপিড়রা গ্রামে প্রবাদ প্রতিম ঝুমুর শিল্পী বিজয় মাহাতো জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মসাল ১৯৫৫, ২রা নভেম্বর। অভাব অনটনে থাকা এক হতদরিদ্র পরিবারের ছেলে ছিলেন তিনি। আড়বাঁশি বাজানোর সাথে সাথে স্বকীয় কণ্ঠে লালন ও ধারণ করেছিলেন জঙ্গলমহলের লোকায়ত জীবনের থেকে উঠে আসা কথা ও সুরের জাদুতে মিশেল অনবদ্য সব ঝুমুর গানের ডালি। প্রয়াণের এক বছর কেটে গেছে, কিন্তু শ্রোতাদের মুখে মুখে সে সব গান আলোড়িত ও উচ্চারিত। বাংলা-বিহার-ওড়িশা সহ ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুরে ঝুমুর গানের জগতে তিনি একটি বিশেষ ধারার পরিচিত নাম। জাতশিল্পী হিসেবে নিজের জাতকে চিনিয়েছেন— এ কথা আদ্যোপান্ত বলাই যায়। ঝুমুর গানের ক্ষেত্রে তাঁকে এক মহীরুহ ও কাণ্ডারী হিসেবে ধরা চলে। কলেজ-লাইফ থেকেই মঞ্চে বাঁশি বাজানোর নামডাক ছিল তাঁর এবং রীতিমতো কলেজের অনুষ্ঠানগুলোতে সাদরে আমন্ত্রিত হতেন তিনি। এরপর ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রফেসর বাঁশি বাজানোর সূত্রে তাঁকে টেনে নিয়ে যায় খোদ কোলকাতায়। একাধিক মঞ্চে তখন কলকাতা শহর পায় এক বংশীবাদকের তোলপাড় করা সুর। বেশ কয়েকটি নামজাদা মঞ্চে বাঁশি বাজিয়েছিলেন এবং শ্রোতাদের মোহিত করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে খালি গলায় শুনিয়েছিলেন ঝুমুরের গান। সেই থেকেই ধীরে ধীরে ঝুমুরের প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা ও আকর্ষণ শুরু। ঝুমুর অনুভবে অনুধ্যানে-চিন্তনে ও মননে। এরপর বৈবাহিক পর্ব সেরে সস্ত্রীক দমদম-টালিগঞ্জ মেট্রোরেল অর্থাৎ পাতালরেলের মাটি কাটার কাজে চলে যান বেশ কয়েক বছর। রেললাইনের কাছাকাছি ছোটো ছোটো তাঁবু পাতা হতো শ্রমিকদের এবং সেখানেই শ্রমিকরা তাঁর বাঁশির পাগল করা সুর মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনত। লোহালক্কড়ের জিনিস থাকায় সেখানে বিশ্বকর্মা পুজোর অনুষ্ঠানে খোলা গলায় ঝুমুরের গান শুনিয়েছিলেন শ্রোতা সহ বাইরে থেকে আসা গেস্টদের। রেললাইনের ঠিকাদার তাঁর বাঁশি আর খোলা গলায় গান শুনে তাঁকে নিয়ে যান কোনও এক নামজাদা শিল্পীর কাছে। মাটি কাটার কাজ শেষ হলে তিনি চলে আসেন নিজের গ্রামে। এখানে থেকেই যাত্রাপথের দ্রুত বদল। অরণ্য-শহর ঝাড়গ্রামে নিয়মিত যাতায়াত ও ঝুমুরের চর্চা। পেয়ে যান লোকগানের গুরুকে। গুরু-শিষ্যের ভাব বিনিময় ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে।

সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। লোকগানের ওই প্রখ্যাত গায়ক ছিলেন অংশুমান রায়। ঝাড়গ্রামের বাছুরডোবার ঘরে দিনভর চলত তাঁদের সাধনার ক্ষেত্র ঝুমুর নিয়ে অনবরত চর্চা। ইতিমধ্যে কোলকাতায় আসা-যাওয়া হামেশাই শুরু হলো তখন। মঞ্চে অংশুমানের গান মানে বংশীবাদক বিজয় আছে।

একদিন উৎসাহ দিয়ে বলেই বসলেন তাঁকে ঝুমুর গান নিজে থেকে গাওয়ার জন্য। এরপর থেকে নতুন উদ্যমে শুরু করলেন জীবনের নতুন অধ্যায়। ঝুমুরও মুখ দেখল বিজয়ের। বিজয়রথের চাকা গড়াল। ওদিকে কোলকাতায় যাতায়াত পর্বে সাক্ষাৎ ঈশ্বর দর্শনের মতো পেয়ে গেলেন সুগায়ক জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়কে। পরে দুজনের কথোপকথন হয়। তাঁর কাছে তালিমও নেন বেশ কিছুদিন। বারোটি গানের ডালি নিয়ে প্রথম ঝুমুরের album হিট হয়। পরের পর ক্যাসেট বেরোতেই থাকে এবং অতি আশ্চর্যজনকভাবে গানগুলি শ্রোতৃবৃন্দদের মনে স্থায়ী আসন পেতে থাকে। পরিচিত হন জনসমক্ষে। ঝাড়খণ্ডের সরাইকেলা All India Radio স্টেশন বেতার শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয় তাঁকে এবং মাসিক সাম্মানিক কিছু প্রদান করতে থাকে। বলে রাখা ভাল, এই রেডিও স্টেশন তাঁকে দেয় 'ঝুমুর-সম্রাট'-এর একচ্ছত্র উপাধি, এই বিশেষণে যাঁকে আজ বাংলা-বিহার-ওড়িশা সহ জঙ্গলমহলের প্রতিটি পল্লী এলাকা চেনে, জানে। বেশ কয়েকজন উঠে আসা ঝুমুরিয়াদের সাথে সাথে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্যভাবে আসে। তাঁর কয়েকটি গানের নাম এ প্রসঙ্গে করা চলে- 'চল মিলি আসাম যাব', 'ঝাড়গাঁর বনে ঝাড়ে', 'বাঁশিটা যে সুরে বাজছে নাই', 'জট জট রাঁধ গো' (যেখানে তিনি ও রেডিওশিল্পী শ্রীমতি রত্না রায় ডুয়েটে গেয়েছিলেন।), 'কইলকাতার কণকলতা রাণিবাঁধের রাণী', 'চল ছাতা ধর কইলকাতা যাব', 'মন্দির মসজিদ গির্জা থান' ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, ড. পশুপতি প্রসাদ মাহাতোর রচনায় 'গঙ্গা নও তুমি কৃষ্ণা নও তুমি, তুমি সুবর্ণরেখা' গানটির ভাষা তাঁর দরদী কণ্ঠে ছাপিয়ে যায়। কবি ভবতোষ শতপথীর 'আকাল বছর আইল ঝড় উড়্যাই লিল চালের খড়' গানটিও ঝুমুর শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে। ঝুমুর গায়কীতে স্বতন্ত্র ইতিহাস রচিত হয় তাঁর। গানগুলি একের পর এক সমাদৃত হতে থাকে। এরকম অনেক গান তাঁর কণ্ঠে অন্য মাত্রা এনেছে। জঙ্গলমহল তাঁকে দিয়েছে শাল-পিয়ালের পত্রালি ভালবাসা, ধামসা মাদলের অপূর্ব সুর আর বাঁশের বাঁশির মনভরানো তাল। তাঁকে ঘিরে প্রাণের শহর ঝাড়গ্রামে তৈরি হয়েছিল ঝুমুর বলয়। ঝাড়গ্রাম গণমাধ্যম এর প্রধান সম্পাদক ও ঝাড়গ্রাম ঝুমুর অকাদেমি-এর দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন সেই তিনিই।

নব্বই দশকে তিনি তাঁর শিল্পী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। প্রিয় মানুষ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছিলেন ঝাড়গ্রামবাসীর খুব কাছের আত্মজন হয়ে। ঝুমুরকে বুকের মধ্যে আগলে রেখে শহর ঝাড়গ্রামে কলেজ রোডের যাতায়াতের পথে একতলার একটি বাড়ির গেটে নাম দিয়েছিলেন 'ঝুমুর ভবন' এবং তার নীচে লেখা শিল্পীর নাম। সারাজীবন উৎসর্গ করেছেন ঐতিহ্যবাহী ঝুমুরের গানে। আদিবাসী ও কুড়মি জনজাতিদের সামাজিক আন্দোলনেও সোচ্চার ছিলেন। বিধানসভা নির্বাচনে এক সময় তিনি ছিলেন মুখ। বছরের শীতকালীন সময়ে ঝাড়গ্রাম যুব মেলা অনুষ্ঠিত হলে একটি মঞ্চ ঝুমুরের জন্য রাখা হত এবং তাতে উঠতি তরুণ শিল্পীরাও গান পরিবেশন করত কেননা অঞ্চল বিশেষে জঙ্গলমহলের কথা ও সুরের প্রতিধ্বনি স্বাভাবিক স্পন্দন খুব কাছের করে পাই আমরা এই মাটির গানগুলোতে। আমাদের প্রাণকে নাড়ায়— হাসি ও কান্নায়। কখনও আমাদের রাজা সাজা আবার কখনো সেই ভিখারির বেশ। মানুষটির অম্লান হাসিমুখ চিরায়ত থেকে যাবে। প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় থেকে যাবে তাঁর নাম ও গানের রেশ। আমরা সুন্দর হাসিমুখের এইরকম রাজাকে যেন আর না দেখি অভিমান আর আক্ষেপিত হৃদয় নিয়ে চলে যেতে। অভাবী সংসারে মাংসের দোকান খুলে মাংসও বিক্রি করতে দেখেছি তাঁকে। একই আক্ষেপ করতে দেখেছি কবি ভবতোষ শতপথীকেও। নাম উচ্চারণ না করে পারলাম

না। পাঠকগণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনারা সকলেই সে বিষয়ে অবগত আছেন বলাই যায়।

যাই হোক, আশার কথা, অধুনা সময়ে বেশ কিছু শিল্পীর গান চোখে পড়ছে— ঝাড়গ্রামের ইন্দ্রানী মাহাত, কবি গবেষক ও ঝুমুর গায়ক হিসেবে কিরিটি মাহাত, সুনীল মাহাত, লক্ষ্মীকান্ত মাহাতোর নাম উল্লেখ করা যায়। আরো অনেকেই আছেন ঝুমুর শিল্পী হিসেবে। ভবিষ্যতে তাঁদের নামও শুনতে পাবো এই সরণীতে / সূচিতে। ইদানিং ঝুমুর নিয়ে গবেষণা ও সেমিনার হচ্ছে। আমরা জানি, দামোদর শতক, সংগীত শতক ও চর্যাপদে ঝুমুরের কথার অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ঝুমুরের পরিসর আরো বড় হোক। অদূর ভবিষ্যতে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ছৌ-এর মতো ঝুমুরেরও একটি স্থায়ী স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে অধিকার তোলার দাবি আরো মজবুত হোক, যেখানে সনাতনি বাংলার লোকজীবন জড়িয়ে আছে, আছে কত কত সামাজিক রীতিনীতি, মনুষ্যজীবনের কথা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ঝুমুরে উদ্বুদ্ধ হোক। দিশা পাক ঝুমুর সামাজিক অর্থনৈতিক ও দেশীয় মর্যাদায়। তাঁর লালন পালন আমাদেরই করে চলতে হবে। শুভ হোক ভবিষ্যৎ। চলমানতা বজায় থাকুক। ঝুমুরের ছন্দে ছন্দে আমরাও দুলে দুলে উঠি আর মাথা নাড়ি, এক বুক উচ্ছ্বাস নিয়ে বেঁচে উঠুক ঝুমুর অন্তঃপ্রাণ হৃদয়।

লেখাটিতে সহায়তা করেছেন : কবি মলয় প্রামাণিক (সংবাদ প্রতিদিনের অতিথি কলামের লেখক ছিলেন তিনি।) ও ক্ষিতীশ মাহাতোর অডিও ক্লিপ।

❁ — ❁ — ❁

দূরত্ব মেনেও নিকটে

রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কোরোনা বা কোভিড-১৯ এসেছে। বেড়েছে, কমেছে আবার বেড়েছে, আবার কমেছে। শুনছি নাকি আরও ঢেউ আসছে। তাহলে কি করোনা এসেছে থাকবে বলেই ? একে দূর করা যাবে না ? নানান উপায়ে প্রতিরোধ করেও নিশ্চিহ্ন করা যাবে না ?

ধরে নিলাম— করোনা থাকবে। আমাদেরও লড়তে হবে। মুখ বেঁধে লড়তে হবে। হাত ধুয়ে লড়তে হবে। স্যানিটাইজার ছিটিয়ে লড়তে হবে। লক্-ডাউন মেনে লড়তে হবে। লক্-ডাউন মানেই কাজ বন্ধ, কলকারখানা বন্ধ, স্কুল-কলেজ বন্ধ, বাজার-হাট বন্ধ, যোগাযোগ বন্ধ.... । অর্থনৈতিক উন্নতি বন্ধ, ধর্মীয় সংসর্গ বন্ধ, সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

'Social Distancing' মেনে চলতেই হবে। প্রথমে তিন ফুট দূরে ছিল। এখন হয়েছে ছ'ফুট দূরে দূরে। দূরত্ব বজায় রাখা খুবই জরুরী। এই দূরত্বের আগে 'সামাজিক' কথাটা যুক্ত। কথাটা একদিকে ব্যঙ্গাত্মক, অন্যদিকে তাৎপর্যপূর্ণ। দাঁড়াবেন দূরে-দূরে, বসবেন দূরে-দূরে, হাঁটবেন দূরে-দূরে; দোকানে, হাটে, বাজারে, স্কুলে, কলেজে, অফিস-কাছারিতে, কলে-কারখানায় ইত্যাদি সর্বত্র দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। তাই স্কুল-কলেজ একদম বন্ধ, পাছে দূরত্ব বিধি শিকেয় ওঠে, পাছে

সংক্রমণ বেড়ে যায়। স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখা বন্ধ, অফিসে কাজ-কর্মে দূরত্বের বিশেষ ক্রিয়াক্রম। বাস, ট্রেন চালানোর ক্ষেত্রেও দূরত্বের বিধি বজায় রাখতে নানান নিষেধাজ্ঞা, প্রয়োজনে গাড়ি চালানোই বন্ধ। দূরকে নিকট করার প্রচেষ্টার বদলে আজ নিকটকে দূর করার জন্যই ভয়ংকর আদেশ জারি হচ্ছে।

দূরকে আরও দূরে রাখতে গিয়ে বা নিকটকে দূরে ঠেলতে গিয়ে আপনকেও পর করে দেওয়া হচ্ছে। সামাজিক অনুষ্ঠান অর্থাৎ বিয়ে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদিতে ৫০ জনের বেশি

লোক সমাগম চলবে না। তাহলে অনুষ্ঠান একরকম সাদামাটা অর্থাৎ অনাড়ম্বরভাবেই সম্পন্ন করতে হবে। আপন যারা তারা অধিকাংশই দূরে থাকবে। পূজার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় সমাবেশ, রাজনৈতিক সম্মেলন-সব কিছুর ওপর নিষেধাজ্ঞা। মন্দিরে দাঁড়িয়ে পূজা দেবেন, আরতি দেখবেন, কীর্তন শুনবেন, পাছে ভীড় হয়ে যায়, তাই মন্দিরের গেট বন্ধ। দল বেঁধে নামাজ পড়বেন, মহরমের শোভাযাত্রা বের করবেন— ভিড় হয়ে যাবে বলে সব বন্ধ। চার্চে প্রার্থনা, বিহারে জমায়েত, পরেশনাথের মিছিল— না, কোনো কিছুই চলবে না। হাত মেলানো বন্ধ, কোলাকুলি বন্ধ, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, কোমরে হাত জড়িয়ে হাঁটা-চলাফেরা বন্ধ। পাশাপাশি বসে ক্লাস করা বন্ধ, পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ, প্রাইভেট কোচিংও বন্ধ। অফ্-লাইন এখন অন-লাইনে পর্য্যবসিত। অন-লাইনে ক্লাস হচ্ছে, পরীক্ষা হচ্ছে, অফিস হচ্ছে, কিন্তু খেলা হচ্ছে না— অলিম্পিক পিছিয়ে গেলো, আই. পি. এল পিছিয়ে গেলো। অন-লাইনে ভোট হচ্ছে না, কোনোটা পিছিয়ে যাচ্ছে, কোনোটা অনেকগুলো পর্যায়ে ভাগ করে করা হচ্ছে।

তাহলে সংসর্গ, সমাবেশ, সম্মেলন, সমাগম— সবই সম্যকভাবে বন্ধ বা বাতিল। সামাজিক দূরত্বের এই যে বিধান এটা মানতেই হচ্ছে, ইচ্ছে না থাকলেও মানতে হচ্ছে। ''সাধে কি বলিরে *বাপ, পেয়াদায় বলায় বাপ!*'' ব্যাপারটা একটু গভীরে গিয়ে ভাবলে বোঝা যাবে— ''পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অসুখ এখন।'' এই অসুখে, পেয়াদার শাসনে আমরা সামাজিকভাবে পরস্পর দূরে চলে যাচ্ছি। ঘুরিয়ে বললে, 'অসামাজিক' হয়ে পড়ছি। 'Social Distancing' আমাদের 'Unsocial' করে দিচ্ছে। কেউ কারও কাছে ঘেঁষছে না, কেউ কারও বাড়ি যাচ্ছে না, গেলেও বাইরে দাঁড়িয়েই কাজ সেরে নিচ্ছে, ভেতরে যাওয়া প্রায়ই বন্ধ। বিয়ে-শ্রাদ্ধ-অন্নপ্রাশন ছেড়ে দিচ্ছি, রবীন্দ্র জয়ন্তী, বিদ্যাসাগরের ২০০ তম জন্মবার্ষিকী, স্বাধীনতার ৭৫তম দিবস কখনও কোথাও সাদাসিদেভাবে হচ্ছে, কোথাও বা হচ্ছেই না।

অনেকে বলতেন, টি.ভি-টা বোকাবাক্স। টি.ভি মানুষকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে দেয়, প্রতিবেশীর সাথে মেলামেশা থেকে শুরু করে সহাবস্থান, সাহায্য, সহানুভূতি, পাশে গিয়ে দাঁড়ানো— সবই কমিয়ে দিচ্ছে। করোনার বিধি আরও ভয়ংকর; সব দিক দিয়েই সবাইকে করে দিচ্ছে 'Socially distant'। এরই মাঝে আলোর বাতি জ্বলছে। যে করোনা রোগীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে অনেকেই আতঙ্কিত, তাকেই নিয়মিত খাবার বা প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দিতে অলক ভট্টাচার্য, পিন্টু ঘোষের দলরা কিন্তু তৎপর, অকুতোভয়। দিকে দিকে, শহরে-গঞ্জে-গ্রামে-পাড়ায় দু-চারজন পাওয়া যাচ্ছেই। সবাই মড়া ফেলে চলে গেলেও 'লালু' কিন্তু যায় না। স্বাস্থ্য-কর্মী, চিকিৎসক, পুলিশ— এঁদের কথা বিশেষ করে বলতেই হয়, না বললে হয় চরম নেমকহারামি— ভীষণ অকৃতজ্ঞতা। দিনে-রাতে,

রাস্তায়-হাসপাতালে, ঘরে-বাইরে এঁরা সবাইকার পাশে, বিপন্নের সহায়তায়, অসুস্থের সেবায় কাজ করে গেছেন, করে যাচ্ছেন, যাবেনও। এঁদের বিশেষ মর্যাদায় আলাদা করে Salute করে যেতেই হয়, মাথা নত করে কুর্নিশ জানাতেই হয়।

'দুঃখ ঘোচাতে ব্যথিতের সাথে দুঃখ মেলাতে হয়'। করোনার বিধিনিষেধ মেনেও 'দুঃখের দুঃখী' হওয়া যায়। যাঁদের মানসিকতায় সমাজ-সেবা, তাঁরা সাহায্য-সহযোগিতায় অন্যের থেকে সবসময় দশ পা এগিয়ে। তাঁরা কিন্তু নবকুমারের মতো কাঠ কুড়োতে যেতে বদ্ধপরিকর। অন্যেরা অধম বা মধ্যম হলেও তাঁরা উত্তম না হয়ে পারেন না। সাধারণ মানুষকে করোনা-আবহে কী কী করণীয় এটা বোঝাতেও যেমন তাঁরা তৎপর, তেমনি বিপন্নকে, অসুস্থকে যাবতীয় সাহায্য যোগান দিতেও তাঁরা এগিয়ে থাকেন, মুখিয়ে থাকেন। এঁরা কারও প্রশংসা-স্তুতি-পুরস্কারের অপেক্ষা করেন না; এঁরা নিষ্কাম, দরদী বা মরমী হয়েই প্রসন্ন। সামাজিক দূরত্বের বিধান মেনেই এঁরা সকলের কাছের মানুষ-আপনজন; সীমার মাঝেই এঁরা অসীম; এঁদের সুরে সুর মেলালে করোনাও হার মানে; সমাজটাও চলে সমাজের মতোই— 'সমাঝে'র মাঝেই।

● — ● — ●

মুক্তি

দেবাশিস দে

কাল সন্ধ্যেতে মেলটা পাওয়ার পর থেকে রাজার মনে স্বস্তি নেই। শুধু ঘর আর বাইর করে যাচ্ছে। রাত্রে ঘুমটাও ঠিক মতো হয়নি। চিন্তা তার একটাই— মৃত্যুর এমন আবদারে কি সায় দেওয়া উচিত ? না সরাসরি নাকোচ করে দেওয়া উচিত ? সহকারীও ভাবনা-চিন্তায় তেমনভাবে সাহায্য করে উঠতে পারল না। বেজায় চিন্তাগ্রস্ত রাজা।

মেলদাতা কস্তূরীও চিন্তায় মগ্ন।— সে কি অন্যায় করেছে ? কিন্তু এটা তো ভালোর জন্যই করতে চায় সে। লোকে কি তাকে খুনি বলবে ? তাও, এই অপবাদ মাথায় নিয়েও মুক্তি দিতে চায় সে।

অবশেষে রাজার রিটার্ন মেল— কোনও মতেই খুনের অধিকার দেওয়া যাবে না। রাজ ভাণ্ডারের অর্থেই কস্তূরীর মানসিক ভারসাম্যহীন পুত্রের সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা করা হবে।

সাইবার কাফের ছেলেটার দেওয়া খবরে কস্তূরী আনন্দে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। ছোটোবেলায় ছেলেকে বাড়িতে রেখে লোকের বাড়ী ঠিকা কাজ করতে যেত কস্তূরী। কিন্তু ছেলে বাড়িতে থাকত না। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াত। লোকেরা ওকে মারত, কামড়ে দিত। বুক ফেটে যেত কস্তূরীর। ছেলে একটু বড় হওয়ার পর থেকে মনকে শক্ত করে ছেলেকে শিকলে বেঁধে কাজে যেত কস্তূরী। উনিশ বছরের ছেলের এই কষ্ট আর সহ্য করতে পারে না কস্তূরী। নিজের বুকে পাথর চাপা দিয়ে, ছেলের যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর আবেদন জানিয়েছিল রাজার কাছে।

● — ● — ●

This document was created with the Win2PDF “print to PDF” printer available at
http://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com/purchase/